জননায়ক বঙ্গবন্ধু

ধন্য সেই পুরুষ

শামসুর রাহমান

তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, এমন এক রাজনীতিক যিনি সর্বতোভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রত্যহ, জীবনের অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত স্বদেশ ও দেশবাসীর প্রতি আত্মনিবেদনে উন্মুখ ও অবিচল এই মানুষটি বারবার প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলেছেন, আমার দেশের জনসাধারণকে আমি ভালোবাসি, তারাও ভালোবাসে আমাকে। এই বাক্য উচ্চারণের সময় যেন গর্বে স্ফীত হতো তাঁর বুক। শেখ মুজিব রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন পূর্ব বাংলার এক সাধারণ পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই সম্পর্কিত হয় সেসব মানুষের সঙ্গে যারা কাজ করে মাঠে, জাল ফেলে নদীতে, দাঁড় বায়, গুণ টানে ধনুকের মতো পিঠ বাঁকিয়ে, গরুর গাড়ি চালায় এবড়ো-খেবড়ো পথে। যৌবনে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে শহরে আসেন। প্রথম থেকেই তাঁর চরিত্রে ছিল নেতৃত্বের উপাদান; এর ফলে পরিণত হন বিশিষ্ট ছাত্রনেতায়, অল্প সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জাতীয় নেতৃবর্গের।

পাকিস্তানের প্রাসাদকেন্দ্রিক, সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারার পাশাপাশি আরও দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল— প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক এবং উঠতি বুর্জোয়াভিত্তিক ধারা। বঙ্গবন্ধু মূলত শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হলে বেশ কিছুটা বলা যেতে পারে প্রভাবিত ছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর সংস্পর্শে এসে তিনি মেহনতী মানুষের স্বার্থকে বড় করে দেখার শিক্ষা পেলেন। গণমানুষের প্রতি শেখ মুজিবের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তাঁর অবিচল রাজনৈতিক নিষ্ঠা লক্ষ করে মজলুম নেতা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যদিও শেষের দিকে দুজনের রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে দুদিকে। কিন্তু শেখ মুজিব কখনও বর্ষীয়ান নেতার প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। নিজস্ব ধরনে স্বদলীয় রাজনীতি করেছেন। দুজনের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেষের দিকে দুজন হয়ে পড়েছিলেন একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এর কারণ আরও কারো কারো মতো আমারও অজানা।

আমি কোনো রাজনীতিবিদ নই। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও নই। আমার সম্পর্ক সাহিত্য জগতের সঙ্গে। নিজেকে এ দেশের নগণ্য লেখক মনে করি

এবং সমাজ সচেতন নাগরিক এবং সাংবাদিক হিসেবে মাঝে মাঝে রাজনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লেখালেখি করি। আমার লেখার সারবত্তা সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু আমি নিজের মনকে চোখ ঠারতে বরাবরই নারাজ। আমার বোধশক্তিতে ঘাটতি থাকতেই পারে কিন্তু আমি কোনো ছল-চাতুরির আশ্রয় নিই না। যা বিশ্বাস করি তা অকপটে বলি এবং লিখি। শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যায়ন করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। তবু তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠার ফলে একজন রাজনৈতিক কর্মী থেকে জনগণমন অধিনায়কে পরিণত হন, এ কথা আমরা সবাই জানি। তাঁর এই সাফল্যের উৎস দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। প্রধানত তাঁর উদ্যোগে ও উদ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক আন্দোলনকে বলীয়ান করেছে যদিও বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকেই। শেখ মুজিব পাকিস্তান আমলে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করেছেন, বারবার নিক্ষিপ্ত হয়েছেন কারাগারে। নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘকাল কারাগারে বন্দি ছিলেন। হিশেব করলে দেখা যাবে শেখ মুজিবের কারাবাসের মেয়াদ তার চাইতে খুব বেশি কম হবে না। মনে প্রাণে বাঙালি এই জননেতা জেল-জুলুম সয়েছেন, বহু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, কিন্তু পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের কাছে মাথা নত করেন নি। আইয়ুব খানের প্রতি মওলানা ভাসানীর মতো নেতাও দুর্বল ছিলেন, কিন্তু মুজিব ছিলেন অনড়, অটল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়িয়ে ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জনগণ জেলের তালা ভেঙ্গে বের করে নিয়ে এলেন তাদের প্রিয় নেতাকে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরই শেখ মুজিব শুরু করলেন ৬ দফা আন্দোলন। এই ৬ দফাকে অনেকে ম্যাগনাকার্টা আখ্যা দিয়েছেন। স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম অসীম সাহসিক, দেশের মাটির কাছে পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ এই জননেতাকে পৌঁছে দিল লোকপ্রিয়তার শীর্ষে; বহু বর্ষীয়ান নেতার জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে গেল তাঁর লোকপ্রিয়তার কাছে। এতে কেউ কেউ ঈর্ষান্বিতও হয়েছিলেন। মুজিব এগিয়ে গেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম তার সীমা অতিক্রম করে গেল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। সারা বাঙালি জাতি মুগ্ধ হয়ে শুনলো শেখ মুজিবের সেদিনের সেই অসাধারণ ভাষণ, যা আজও আমাদের আন্দোলিত করে। বস্তুত সেদিনই ঘোষিত হলো আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের যে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন তার নজির খুব বেশি নয়। পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের কোনও কর্তৃত্ব এই ভূখণ্ডে ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালি জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু সেজন্য তেমন প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি। এ কথা বলতেই হবে। কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই বীর বাঙালি 'জয় বাংলা' আওয়াজ তুলে অস্ত্র ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে, হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতা শুরু হওয়া গণহত্যার পর। শেখ মুজিব বন্দি হলেন পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে। নয় মাস তিনি বন্দি হয়ে থাকলেন পাকিস্তানের কারাগারে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলল তাঁরই নেতৃত্বে, প্রেরণার উৎস হয়ে থাকলেন অবিসংবাদিত নেতা, শেখ মুজিবুর রহমান। মজার ব্যাপার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে মহিমা কীর্তনে এতই মশগুল যে, একাত্তরে মেজর জিয়ার ঘোষণার ফলেই যেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু একাত্তরের সাতাশে মার্চে কে চিনতো মেজর জিয়াকে? সেই ঘোষণার আগে কেউ যার নাম শোনে নি তাঁর ডাকে সবাই লড়াই শুরু করে দেবে, এ রকম মনে করা বাতুলতারই নামান্তর। কেননা, সেই বেতার ঘোষণায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের কথা উচ্চারিত হয়েছিল খোদ মেজর জিয়ারই কণ্ঠে বেশ কয়েকবার। অবশ্য পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম মুছে ফেলা হয় নির্লজ্জভাবে। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশের স্থপতির নাম বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে, সরকার-নিয়ন্ত্রিত রেডিও টেলিভিশন থেকে মুছে ফেলার এক নিরন্তর অপচেষ্টা করে আসছে। নতুন প্রজন্মকে ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে ছলেবলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের হাল ধরলেন। তখন দেশে নানা সমস্যা সঙ্গীন উঁচিয়ে রয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠালেন তিনি। অন্য কেউ এত সহজে এই সমস্যার সুরাহা করতে পারতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তিনি হয়তো কিছু কিছু ভুল করে বসলেন; একাত্তরের দালাল ও ঘাতকদের বিনা বিচারে ক্ষমা করে দিলেন। শোনা যায়, যেসব দালালকে সাময়িকভাবে আটক করা হয় তাদের কারো জন্য তিনি জেলখানায় খাবার পাঠাতেন। একজন সাংবাদিক মুজিবকে এই ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি জবাব দেন, 'তোমরাই তো আমার এই সর্বনাশ করেছো। কেন আমাকে জাতির পিতা বানাইলা? পিতা তো ক্ষমা করবেই।' চরমপত্র খ্যাত এম আর আখতার মুকুল তাঁর 'মুজিবের রক্ত লাল' গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন মুজিব একবার তাঁকে এবং বিশিষ্ট প্রবাসী সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা বলেন তো আমার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কী কী দোষ আছে?' আব্দুল গাফফার চৌধুরী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'অভয় দিলে বলতে পারি, আপনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের মতো মাদার্স হার্ট— মানে কি না মায়ের ক্ষমাসুন্দর হৃদয় নিয়ে দেশ শাসন করেছেন, তাই সমস্যা অনেক বেশি মনে হচ্ছে। এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবার সময় আপনার হৃদয় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো নির্দয় হলে এতদিনে অনেক এগুতে পারতেন।'

বঙ্গবন্ধু কোনো ব্যারাক থেকে ব্যাটন ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেন নি রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পদে। আমলার গদি ছেড়ে চেপে বসেন নি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোনো আসনে। তিনি ছিলেন এদেশের মাটি থেকে উড়ে আসা এক প্রতিভাবান সন্তান, প্রকৃতপক্ষে মাটির মানুষ, জনসাধারণের একান্ত আপনজন। অনেকে একজন প্রশাসক হিসেবে তাঁর দুর্বলতার কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমান সংসদ সদস্য সাবেক উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মুজিবভক্ত হিশেবে পরিচিত নন, বরং আওয়ামী লীগের শাসনামলের একজন কঠোর সমালোচক, তবে তিনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কখনও কোনো অশালীন মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই। এই তো সেদিনও তিনি জাতীয় সংসদে শহীদ মুজিবের তারিফ করেছেন। যা হোক, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে লিখেছেন, যদিও শেখ মুজিবকে প্রায়ই তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং উপলব্ধি ক্ষমতার অভাবের জন্য সমালোচনা করা হয়, কিন্তু তিনি প্রখর সহজাত বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক সচেতনতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মানবিক গুণাবলী, তাঁর দয়া এবং ঔদার্য কোনো কোনো সময় মাত্রাতিরিক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মধ্যে বাঙালির সব ধরনের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল।... প্রশাসক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হয়ে থাকতে পারেন, তবে তাঁর নিজের কারণে নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর দলের লোকদের লোভ, অযোগ্যতা ও শ্রেণী চরিত্রের কারণে। আর ছিল নয় মাস যুদ্ধের ফলে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থা।'

জনাব মওদুদ আহমদের মন্তব্যে ভক্তিবাদের কুয়াশা নেই, সত্যের স্বাক্ষর আছে। তিনি বাকশালকে কোনো ভ্রান্ত নীতি মনে করেন নি। তাঁর মতে বাকশালের সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তবে শেখ মুজিব ভুল সময়ে বাকশাল প্রবর্তন করেন। আমি নিজেও মনে করি, ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা সুবিবেচনা প্রসূত নয়। গোড়ার দিকেই এমন একটি ব্যবস্থা নিলে ভালো হত। শেখ মুজিব গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রে কি তিনি প্রকৃত সমর্পিত ছিলেন? এই প্রশ্ন আমার মনে আজও নাড়াচাড়া করে। তিনি তো মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া শক্তির বিকাশের পক্ষপাতি ছিলেন বলে আমার ধারণা। যদিও কৃষক-মজুরদের জন্যে তাঁর প্রাণের টান ছিল অকৃত্রিম। যাই হোক, ১৯৭২ সালের নন্দিত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম ছিল সমাজতন্ত্র। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সম্মতি না থাকলে এটি নিশ্চয়ই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। সারা জীবন গণতন্ত্রের সাধক হয়ে তিনি নিজে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাঁর চরিত্রবিরোধী কাজ। কিন্তু কেন? হয়তো তিনি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অনুসরণে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এতে তার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, আসবে স্বয়ংনির্ভরতা।

খন্দকার মোশতাক আহমদের সময় থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশের পাকিস্তায়ন প্রক্রিয়া বেশ সুপারিকল্পিতভাবে। যারা শেখ মুজিবকে হত্যা করে তারা শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালালই নয়, মানসিকভাবে পাক্কা পাকিস্তানী। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ওঝা সেজে পাকিস্তানী ভূত তাড়ানোর চেষ্টা তো করলেনই না বরং সেই ভূতটি যাতে এ দেশের বাসিন্দাদের কাঁধে আয়েশে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে পারে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, পাকিস্তান মনোভাবাপন্ন লোকজনের মন্ত্রিসভায় সম্মানিত আসন দিয়ে। তিনি সংবিধান থেকে নির্বাসিত করলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানের অঙ্গীভূত করে শেখ মুজিব ও তার পরিবারবর্গের এবং কারাগারে আটক আওয়ামী লীগের চার নেতা হত্যাকারীদের বিচার নিষিদ্ধ করে দিলেন। এর নজির কোনও সভ্য দেশে নেই।

শেখ মুজিবকে নাকি দেশের মঙ্গলের জন্য হত্যা করা হয়। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু কিংবা নববধূকে কেন হত্যা করা হয়? তারা তো কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। মুজিবকে হত্যা করে দেশের যে কী আহামরি শ্রী বৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়েছে সে তো আমরা গত ১৬ বছর ধরে দেখে আসছি। যারা শেখ মুজিবের মতো বড় মাপের মানুষ, সিংহ হৃদয় দেশপ্রেমিক এবং সেই রাষ্ট্রের স্থপতিকে খুন করতে পারে আর যারা এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে তারা যে কোন স্তরের জীব তা সহজেই অনুমেয়। শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান অন্নদাশংকর রায়ের একটি কবিতা মনে পড়েছে। কবিতাটির নাম 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের স্মরণে'

নরহত্যা মহাপাপ, তারচেয়ে পাপ আরও বড়ো
করে যদি যারা তাঁর পুত্রসম বিশ্বাসভাজন
জাতির জনক যিনি অতর্কিতে তাঁরই নিধন
নিধন সবংশে হলে সেই পাপ আরো গুরুতর
সারাদেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে ঘোর পাপের
যদি দেয় সাধুবাদ, যদি করো অপরাধ ক্ষমা
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ বজ্ররূপে সে অভিশাপের
রক্ত ডেকে আনে রক্ত, হানাহানি হয়ে যায় রীত
পাশবিক শক্তি দিয়ে রোধ করা মিথ্যা মরীচিকা
পাপ দিয়ে শুরু যার নিজেই সে নিত্য বিভীষিকা
ছিন্নমস্তা দেবী যেন পান করে আপন শোনিত
বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো না নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

আবার জনাব মওদুদের মুজিব বিষয়ক বইটির পাতা ওল্টানো যাক। তিনি লিখেছেন, মনে হয় শেখ মুজিব একটি অমরতার পাদপীঠ থেকে ফিরে আসেন শুধু তার দেশের সংগ্রামলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করতে। এই বাক্যটি আমার বুঝাতে চেষ্টা করেছে, আহা শেখ মুজিবের ভাগ্যে আখেরে অমরত্ব জুটলো না। জ্বী না। জ্বী না ব্যারিস্টার মওদুদ, আপনার এ কথা মেনে নিতে পারি না। পাকিস্তানী জান্তার হাতে নিহত হলেই মুজিব অমর হতেন আর এখন তিনি অমরতার পাদপীঠ থেকে অনেক দূরে; এ কথা আপনার মতো সুতার্কিক আইনজীবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হলেও তাতে আমার মতো সামান্য বুদ্ধির ব্যক্তি সায় দিতে নারাজ। যেন সর্বকালের বাঙালিদের ধন্য পুরুষদের একজন, যিনি না হলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এত বিকশিত হতো না। বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতো না, তিনি অমর হবেন না তো কে হবেন? তাঁর দোষ-ত্রুটি এবং রাজনৈতিক ভ্রান্তি সত্ত্বেও তিনি অমরদের একজন। যতদিন বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং সংস্কৃতি টিকে থাকবে ততদিন এ দেশের মানুষদের চেতনায় অমর হয়ে থাকবেন ধন্য সেই পুরুষ। বাংলা মায়ের মহান সন্তান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

এক

রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাই বলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জন্মান না। বংশ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিত্তের ওপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকখানি নির্ভর করে। শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে এসবের কোনোটারই বিশেষ ভূমিকা ছিল না। আজ বংশরাজনীতি যেভাবে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছেয়ে গেছে, তেমন অবস্থা বাংলাদেশে ছিল না। শেখ মুজিবকে কর্মী হিসেবে অন্যদের প্রশংসা কুড়াতে হয়েছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, দাবি-দাওয়ার প্রস্তাব এবং তা আদায় করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের সেই কৈশোর ও ছাত্র অবস্থা থেকেই এক ধরনের পারঙ্গমতা ছিল। সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রা-হরতাল সংগঠনের অভিযোগে ১৯৪৮-এর মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার 'অপরাধে' ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। সে সময় কয়েকজন আন্দোলনকারী ভবিষ্যতে সৎ আচরণের মুচলেকা দিলে তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিব কোনো মুচলেকা না দেওয়ায় তাঁর বহিষ্কার আদেশ বহাল থাকে। কর্মী থেকে আঞ্চলিক নেতা এবং আঞ্চলিক বা গোষ্ঠী নেতা থেকে সারা দেশের অবিসংবাদিত নেতা হতে শেখ মুজিবকে নিরলস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হয়েছে। তার জন্য সরকারের রুজু করা একাধিক মামলায় তাঁকে আসামি হতে হয়েছে এবং কারাবরণ করতে হয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার কোনো বিরতি বা ছেদ ছিল না। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রলীগ গঠন, ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগ গঠন ও খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ভুখা মিছিলের আয়োজন, ১৯৫১ সালে পাকিস্তান গঠনতন্ত্রের খসড়া মূলনীতির বিরোধিতা, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে কারাগারে অনশন, ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার

বিজয়, ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ, ১৯৫৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও সাংবিধানিক সংখ্যাসাম্যের বিরোধিতা, ১৯৫৭ সালে কাগমারি সম্মেলনে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে কারাবাস, ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতিবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, ১৯৬৩ সালে আইয়ুবি সংবিধানের বিরোধিতা এবং ন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি থেকে পদত্যাগ, ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অনিরাপত্তাজনিত অবস্থার পর্যবেক্ষণ, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবির প্রস্তাব, ১৯৬৭ সালে ১২টি মামলার সঙ্গে যোঝাযুঝি, ১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার এক নম্বর আসামি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহার, ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণকার্যে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা ও সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১৯৭১ সালের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন— একটি বাক্যে শেখ মুজিবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বছর না যেতেই রাজস্ব-বণ্টন, উর্দুকে একক রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কথাবার্তা ও আচরণে এক অসহ্য শ্রেয়ম্মন্যতার আবহাওয়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ তাদের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা সম্পর্কে সোচ্চার হয়।

২৫ আগস্ট ১৯৫৫ সাল পাকিস্তান গণপরিষদে 'পূর্ববাংলা' নামের বিলুপ্তির বিরোধিতা করে শেখ মুজিব বলেন :

Sir, you will see that they want to place the words 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to Change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it.

পূর্ববাংলার বেশির ভাগ নেতা 'পূর্ববাংলা' নাম বিলোপের বিরোধিতা করলেও মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামপন্থীরা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামের বিরোধিতাকে পাকিস্তান আদর্শ বর্জনের সমতুল্য বলে তুমুল হৈচৈ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক শান্তনু মজুমদার বছর চারেক আগে এক সাক্ষ ৎকারে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাষা আন্দোলনের সময় নাকি আরেকটা স্লোগান ও উঠেছিল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই?' উত্তরে সরদার ফজলুল করিম বলেন :

এ রকম কোনো স্লোগান কোনো বড় জায়গা থেকে অত তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। কমিউনিস্টরাই এই রাস টেনে ধরার কাজটা

করেছিলেন। শেখ সাহেবসহ আরো যাঁরা জঙ্গি ছিলেন তাঁদের উত্তেজনা প্রশমন করাতে হয়েছিল। শেখ সাহেব মণি সিংহকে বলেছিলেন, 'দাদা কী কন।' মণি সিংহ ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রটাকে গণতান্ত্রিক করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিলেন। ঠিক যে, পাকিস্তান অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু যথার্থ সময়ের আগে কোনো কিছু করলে হঠকারিতা হয়ে যায়। ('ভাত আর ভাষার অন্তর্গত সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক', ভোরের কাগজ, ১৪ ফাল্গুন ১৪০৫/২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

অন্য এক প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

ঢাকা থেকে একদিন কলকাতায় আসেন ঐতিহাসিক ডক্টর হাবিবুল্লাহ। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা স্বাধিকার দাবি করছি বটে, কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য স্বাধীনতা।' আমি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলি, 'খবরদার, ও কথা মুখে আনবেন না। পাকিস্তানি সেনা ভীষণ অত্যাচার করবে।' ('মুক্ত বঙ্গের স্মৃতি', বাংলাবাজার পত্রিকা, ১১ ফাগুন ১৪০৫/২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)।

লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান হাউসের এক বৈঠকে কিছু তরুণ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা পাড়লে তিনি ভীতচকিত হয়ে বলেন, 'তাহলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।' একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ভাঙনে রক্ত প্রবাহিত হওয়ারই কথা।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ লাহোরে শেখ মুজিব ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সংবাদপত্রে এই শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারি দপ্তরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী ছয়-দফাকে 'দেশদ্রোহিতার নামান্তর' বলে অভিহিত করেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম ও এম এন এ খাজা খায়রুদ্দিন এক সংবাদ সম্মেলনে ছয়-দফাকে 'বিপজ্জনক' বলে বিশেষিত করেন। ১০ মার্চ ১৯৬৬ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হুমকি দিয়ে বলেন, 'ছয়-দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ চাপাচাপি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া হবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ হয়ে যাবে।'

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানে যেসব ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলীর মৃত্যু, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে নাজিমউদ্দীনকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নিয়োগ, পূর্ববাংলায় গভর্নর-শাসন, ১৯৫৪-তে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া, ১৯৫৬-র সংবিধান বাতিল ও ১৯৫৮-র সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৫৮-৬২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও আমলার নিয়োগ-বদলি, ১৯৬২-তে আইয়ুবের সংবিধান প্রবর্তন, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৯-এ পূর্ব পাকিস্তানবাসী স্পীকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল এবং অবশেষে ১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয়

পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ— সব ঘটেছে অবাঙালি আমলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসাজশে। এরপরও ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের মমতায় যাঁরা পাকিস্তানের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অতি দ্রুত নতুন প্রজন্মের শ্রদ্ধা হারান। আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা, নজরুল-প্রক্ষালন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভোল পালটানোর যে চেষ্টা হয়, তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বাংলাদেশের তরুণদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে।

'অপূর্ব সংসদ'-এর তরুণ সদস্যরা দেশে-বিদেশে 'ইস্ট পাকিস্তান ফর এভার' বলে দেশপ্রেমের কথা বলেন। ষাটের দশকের শেষার্ধে লন্ডনে 'ইস্ট পাকিস্তান ফর ইস্ট পাকিস্তান, উইথড্র অক্যুপেশন ট্রুপস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান' বা 'ফর ইস্ট পাকিস্তান' বা 'ফর ইস্ট পাকিস্তান ফুল অটোনমি অর ফ্রিডম : ফ্রিডম'— এ ধরনের ব্যানার হাতে করে কিছু কিছু তরুণ রাজনৈতিক কর্মী শোভাযাত্রা করেন। ৭ এপ্রিল ১৯৬৯ সালে লন্ডনের 'দৈনিক টাইমস'-এ সেই ব্যানারের ছবিসহ শোভাযাত্রার এক আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার লেফটেন্যান্ট কমোডর মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয় এবং সম্প্রতি সেই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে তথ্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে তার থেকে মনে হয় না পাকিস্তান সরকারের অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ছিল। সার্জেন্ট জহুরুল হক তো পাকিস্তানদ্রোহিতার অভিযোগের উত্তরে কসুর-কবুল করতে চেয়েছিলেন। দেশের লোক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' বিশ্বাস করেনি। অনেকে ভেবেছিলেন, এমন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলে ভালোই হয়েছে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিব বলেন :

একসময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই... আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু 'বাংলাদেশ'।

৭ জুন ১৯৭০ তিনি ঘোষণা দেন, 'আসন্ন নির্বাচন হবে ছয়-দফার প্রশ্নে গণভোট।' ১ জুলাই ১৯৭০ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের অবসান ঘটে। পশ্চিম পাঞ্জাবের নতুন নাম হয় পাঞ্জাব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নাম অপরিবর্তিত রইল। পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলা' বা এমনকি 'পূর্ববাংলা'ও হলো না।

১২ নভেম্বর ১৯৭০ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ১০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে। ত্রাণকার্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে অনীহা প্রকাশ করে সেই আবহাওয়ায় ২৮ নভেম্বর

১৯৭০ শেখ মুজিব বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ লোক মারা গেছে। স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলার আরো ১০ লাখ প্রাণ দেবে।'

৭ মার্চ শেখ মুজিব 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত থাকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত। ২৫ মার্চ ভুট্টো বলেন, 'আওয়ামী লীগ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তাকে আর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। ওদের দাবি তো স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশি, প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।' ২৬ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ফলে অতি দ্রুত 'স্বাধীনতা'র প্রশ্নটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। ইতোমধ্যে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এবং ২৩ মার্চ থেকে দেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।

২৬ মার্চ চট্টগ্রামে মুখে মুখে একটা খবর হয় যে, ওই রাত্রে 'প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে শক্তি সংহত করার জন্য শেখ মুজিব এক বাণী পাঠিয়েছেন। ২৭ মার্চ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র কালুরঘাট থেকে 'মহান নেতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ'-এর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান এক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। পরে ১০ এপ্রিল 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা' বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগর) এক গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

দুই

বদরুদ্দীন উমর বছর চারেক আগে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, এটা এখন অতি উচ্চঃস্বরে প্রচারিত হলেও এর চাইতে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। এ রকম কে কবে শুনেছে যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে এবং জনগণকে সেই যুদ্ধে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে কোনো সেনানায়ক কিংবা মহান রাজনৈতিক নেতা নিজে বাড়িতে বসে থেকে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এটা করেন যখন তাঁর নিজ দেশের হাজার হাজার মানুষ ফ্যাসিস্ট সামরিক বাহিনীর হাতে মারা পড়ছেন।' (সাপ্তাহিক ২০০০, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৯)

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিলাম। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটির প্রধান দপ্তর স্থাপন

করা হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে, স্টেশন রোডের ডাকবাংলোয়। ২৬ মার্চ দুপুরে সেখান থেকে আমাকে টেলিফোন করেন অ্যাডভোকেট রফিক। বলেন, জরুরি বার্তা আছে, লিখে নিন এবং ক্যাম্পাসে ও আপনাদের এলাকায় প্রচারের ব্যবস্থা করুন। লিখে নিলাম বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা-ঘোষণা'। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান সেটাই পাঠ করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বকণ্ঠে ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওই বেতার কেন্দ্র থেকেই। আমি শুনিনি। অনেকেই শুনেছিলেন। ২৮ মার্চে জিয়াউর রহমান সংশোধিত ঘোষণা পাঠ করেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাঁর সঙ্গে ১০ এপ্রিলে রামগড়ে আমার দেখা হয়। আমি যখন বলি যে, বেতারে তাঁর ঘোষণা শুনেছি, তিনি জানতে চান, কোনটা? আমি বলি, যেটায় আপনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়ার ঘোষণা আমাদের অনেক শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল। এ ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব লঘু করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু জিয়ার অনুরাগীরা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কথা অস্বীকার করতে চান। বঙ্গবন্ধু নিজে ঘোষণা লিখে গিয়েছিলেন, না তাঁর নামে ঐ ঘোষণা প্রচার হয়েছিল–এ সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু ঘোষণা যে প্রচারিত হয়েছিল এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার আগেই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বঙ্গবন্ধুর নামে ওই ঘোষণা প্রচারিত না হলেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে থাকতেন। (মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, 'একতা কেন', ১৯৯৯, পৃ. ৬৫)

২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তা সাম্প্রতিক কালের দেশের অন্যান্য বিরোধী বিষয়ের মতো অদূর ভবিষ্যতে নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হয় না।

শেখ সাহেবকে একবার কথায় কথায় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর অননুকরণীয় ভাষাতেই শোনা যাক :

'আপনার হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয় প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, 'তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল।' শেখ সাহেব কইলেন, 'আগামী ইলেকশানে অপজিশন পার্টিগুলো ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না।' আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, 'আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়া দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবের স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না। ('যদ্যপি আমার গুরু', আহমদ ছফা)

পরে যখন শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখন 'বাংলাদেশ : স্টেট অব নেশন' বক্তৃতায় অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেন এবং তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে উল্লেখ করেন ষোলবার। বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এ সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল।' (উক্ত ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা ভাষ্য)

রাষ্ট্রপতি সায়েম আমাদের বলেছেন যে, ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন চতুর্থ সংশোধনী একটি সাময়িক পদক্ষেপ এবং তিনি উক্ত সংশোধনীর পূর্বেকার সংবিধান আবার ফিরিয়ে আনবেন। রাষ্ট্রপতি সায়েম লিখেছেন, 'আমার এ-কথা মনে করার কোনো কারণ ছিল না যে, তখন তিনি যা বলেন তা তাঁর মনের কথা নয়, সংসদ তাঁরই, মানে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য ছিল তাঁরই দলের।'

দুর্ভাগ্য, তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, যাঁকে তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়, তাঁর মতো সৌভাগ্য শেখ মুজিবের হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী যে উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকুক না কেন, এর ফলে বাংলাদেশ তার বহু অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রতি যে একাত্মতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বের মানুষের মনে উৎসারিত হয়েছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ সংশোধনীর নানা সমালোচনা সত্ত্বেও শক্তিধরদের কাছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মোটামুটি বেশ উপাদেয় ঠেকেছে।

শেখ মুজিবের জীবন লক্ষ্য করলে একটা জিনিস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, একজন অবিসংবাদী নেতার জনপ্রিয়তা কত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে পারে এবং ব্যক্তিটি কত বিভিন্ন বিষয়ে অকস্মাৎ বিতর্কিত হয়ে উঠতে পারেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তা কিছুটা নষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল তার পেছনে রয়েছে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ও হতাশার টানাপড়েন, শেখ মুজিবের শত্রুদের নিরলস প্রয়াস এবং তাঁর বন্ধুবর্গের নিষ্ক্রিয়তা। ক্ষমতায় আসার আগে শেখ মুজিব যে সাফল্যের সঙ্গে বিরোধী রাজনীতি করেছিলেন, সরকারি প্রশাসনের কর্ণধার হওয়ার পর সে সাফল্য অন্তর্হিত হলো। সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের তিনি শনাক্ত

করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল না তাদের প্রশাসনে রেখে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন সাবধানবাণী কাস্ত্রো, টিটো বা বুমেদিয়েন উচ্চারণ করে থাকলেও বিরল আত্মবিশ্বাসে শেখ মুজিব সে সম্পর্কে তখন তেমন দুশ্চিন্তা করেননি। আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে কাস্ত্রো শেখ মুজিবকে এই বলে হুঁশিয়ার করেন যে, পৃথিবীময় তিনি শত্রু সৃষ্টি করেছেন। শেখ মুজিব যে অহংকারে নিজেকে অজাতশত্রু মনে করেছিলেন তার ভিত্তি মোটেই শক্ত ছিল না।

দেশের কতটুকু শক্তি বা কতটুকু দুর্বলতা তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বাঙালি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করায় এবং তা বড় অসম্পূর্ণভাবে সমাধান করায় জাতীয় অর্থনীতিতে সুফল আসেনি। বরং তাতে দেশের উৎপাদক ব্যবসায়ীরা মনঃক্ষুণ্ন হন। খুচরো ব্যবসায়ী রাতারাতি বড়লোক হয় মজুতদারির সুযোগ পেয়ে। হঠাৎ অনর্জিত মুনাফার মধ্যে পুঁজির প্রয়োজনীয় কাঠিন্য বা স্থৈর্য ছিল না। শেখ মুজিব গঠনমূলক চিন্তা করার অবকাশ বা অবসর পাননি। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতাহীনতা ও কোন্দল, সুযোগসন্ধানী বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের ক্ষমতার বলয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ও দুর্নীতি, অর্থনীতিবিদদের অবাস্তব পরিকল্পনা এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিদের সীমাহীন অর্থলিপ্সা মধ্যাহ্নে অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল।

তিন

শেখ মুজিবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল বিস্ময়কর। নাইজেরিয়ার জেনারেল ইয়াকুব গাওয়ান যখন বললেন, 'অবিভক্ত পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশ, কেন আপনি দেশটাকে ভেঙে দিতে গেলেন।' উত্তরে শেখ মুজিব বললেন, 'শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়তো শক্তিশালী ছিল। তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়ে শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?'

কোনো আরব রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবের আমলে বাংলাদেশের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা দেশের নামের আগে বিশেষ কোনো শব্দ সংযোজনের প্রস্তাব করার সাহস পাননি।

যুগসন্ধির প্রভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভাবান্বিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগে উপনিবেশ-বিমুক্তির আন্দোলনের সময় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্র এবং তা সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালে দেশে যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ করা হয় তার দাবি ১৯৪৭ সালের পর থেকেই আলোচিত হয়ে

এসেছিল। সেটা যে জনগণেরও দাবি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটি যে সফল হয়নি তারও কারণ অনেক। আমাদের পাশের দেশ ভারত মিশ্র-অর্থনীতির জগতে সেদিন নেতৃত্ব দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি তিন দশক পরে ঘটত তবে কি আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তেমন তাগিদ থাকত বা সমাজতন্ত্রের একটা নতুন অর্থ প্রদান করার প্রয়োজন হতো? দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে যে বেসরকারিকরণের কথা আজ এত প্রাসঙ্গিক, সোভিয়েত রাশিয়ার জয়কালের সময় তা উত্থাপিত হয়নি। সেদিন রাশিয়ার অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বহু রাষ্ট্রের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয় ছিল। আমাদের দেশের একদলীয় শাসনের সূত্রপাত বড় অসময়ে হয়েছে। সমাজতন্ত্র কোনো অর্থনীতিক জীবন বা সামাজিক সুফল রেখে যায়নি।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ মিত্রশক্তির কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর পরই পাকিস্তানপন্থীরা দেশে ও বিদেশে তৎপর হয়ে ওঠে। যেসব দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের সামান্য চিহ্ন ছিল সেসব দেশ বাংলাদেশের বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করায় সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে কোনো সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রকাশ করেনি। সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশকে সাহায্য করায় চীন তার মিত্র দেশ পাকিস্তানকে পুরো সমর্থন জানায়। সোভিয়েত রাশিয়া বা সমাজতন্ত্রী দেশ সম্বন্ধে যেসব দেশ ভিন্নমত পোষণ করত তারা প্রায় সবাই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। জনসংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হলেও মুসলিম বিশ্বে তার অবস্থা ছিল বড়ই অনাদরের। সেই মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি এবং বিশেষ করে যে দেশ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে সে দেশের স্বীকৃতি সম্পর্কে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার বড় দুশ্চিন্তায় ছিল।

একটি সদ্য স্বাধীন দেশ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে বাজেট সমন্বয় করা ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণের জীবন ব্যতিব্যস্ত। সেই সংকটকালে অন্য দেশের মতামতকে অগ্রাহ্য করা সমীচীন মনে না করে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কয়েক লাখ লোক পাকিস্তানে আটকে পড়ে। কয়েক সহস্র বাঙালি কর্মচারীকেও পাকিস্তান সরকার আটক করে রেখেছিল। এই আটকেপড়া ও আটক হওয়া বাঙালিদের ফেরত নিয়ে আসার লবি বাংলাদেশ সরকারের ওপর এক দারুণ চাপ সৃষ্টি করে। পাকিস্তান তা ভালোভাবেই বোঝে এবং পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তা পুরোদস্তুর কাজে লাগায়।

জে এন দীক্ষিত তাঁর 'লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড'-এ বলেছেন, 'এমনকি এই স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ কিংবা মামলার নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে তেমন তৎপর ছিল না।'

মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত) হাকসারকে নাকি বলেছিলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধার কারণে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-বিষয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিত বলছেন, হয়তো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কথা ভেবেই মুজিব এ ধরনের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে চালিত হয়েছিলেন। তিনি এমন কিছু করতে চাননি যাতে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দিকে আটকে রাখলে এবং যুদ্ধাপরাধীনের বিচার শুরু করলে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হতো। স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশ উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চায় বলে সমালোচনা হতো : উপমহাদেশে শান্তি ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার বৃহত্তর স্বার্থে মুজিবুর রহমানের এ মনোভাব সঠিকই ছিল। আর তা ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ভুট্টো-ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক আয়োজনে সাহায্য করে।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন, 'আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যাঁরা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপনের আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যাঁরা ভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও অনুতপ্ত হলে তাঁদের দেশগড়ার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।'

বাংলাদেশ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষণ দান করেন। তিনি বিশ্বশান্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে বলেন : 'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।'

২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'কোনো দেশের ইতিহাসে নাই বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো দেশে, কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম... সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম।... বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাসুন, দেশের জন্য কাজ করুন, (দেশের) স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নিন, থাকুন। কিন্তু (তাঁদের) অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তাঁরা এখনো গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।'

২৬ মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি বললেন, 'ভায়েরা, বোনেরা আমার আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা কো-একজিস্টেনসে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এ জন্যে যে, এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানিরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও আমাকে দিল না এবং যাবার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করলো, রাস্তা ধ্বংস করলো, রেলওয়ে ধ্বংস করলো, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে পারবো যে, তোমরা কী করেছো।'

পশ্চাদ্‌চিন্তার অনেকের মনে হতে পারে যে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারলে বাংলাদেশ তার নিজের স্বার্থ অধিকতর সফলতার সঙ্গে রক্ষা করতে পারত। জুলফিকার আলি ভুট্টো শক্তির ভাষা সহজে বুঝতেন। শীর্ষস্থানীয় কিছু পাকিস্তানি জেনারেলের প্রকাশ্য বিচার হলে বাংলাদেশ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীরা বিচার, বিহারিদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব এবং বিভাগোত্তর দেনা-পাওনার প্রশ্নে বাংলাদেশের আরো সুবিধা হতো এবং সিমলা চুক্তির আগেই হয়তো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিত। পশ্চিম পাকিস্তানি এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানকে

সম্পৃক্ত করা যেত। বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক মহলে যে সহানুভূতি ছিল ১৯৭৪ সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পর তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। আন্তর্জাতিক জগতে কূটনীতির নানা টানাপড়েনে বাঞ্ছিত লক্ষ্যও অনেক সময় অনায়ত্ত থেকে যায়।

চার

পাকিস্তান আমলে দেশের বরেণ্য নেতাদের 'শেরে বাংলা', 'কায়েদে আজম' বা 'কায়েদে মিলাত' অভিধায় ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে যে সম্মাননার নামে ভূষিত করা হলো সেই বঙ্গবন্ধুর নামের জন্ম বাংলা ভাষায়। চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু অভিধায় সম্মানিত করার নজির থাকলেও পদ্মা-যমুনা-মেঘনার দেশের নেতাকে সেই দেশের ভাষায় সম্মাননায় ভূষিত করার ব্যাপারটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন।

জসীম উদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, সিকানদার আবু জাফর, শামসুর রাহমান প্রমুখ আমাদের কবিদের কাছ থেকে শেখ মুজিব যে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা প্রশংসা পেয়েছেন তার সৌভাগ্য সমসাময়িক কালে আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

১৮ জানুয়ারি ২০০১ জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি বেসরকারি বিল পাস হয়। জাতির পিতার প্রতি কটূক্তি ও অবমাননাকর কোনো লিখিত বা মৌখিক বিবৃতির জন্য অনূর্ধ্ব ৩ মাস কারাদণ্ড ও অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করা হয়। ওই ২০০১ সালের ২ নম্বর আইনে জাতির পিতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় :

'জাতির পিতা' অর্থ বাংলাদেশের স্থপতি এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নম্বর আইন)-এর ধারা ৩৪-এর দফা (খ) দ্বারা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (;)।

২০ জুন ২০০১ ধ্বনিভোটে সংসদে জাতির পিতার পরিবার সদস্যগণের নিরাপত্তার আইন পাস হয়। ওই ২০০১ সালের ২৯ নং আইনে 'জাতির পিতার একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা দেওয়া হয় :

জাতির পিতার অর্থ The Proclamation of Independence বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রূপকার এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) এবং ধারা ৩৪-এর দফা (৪) দ্বারা সাংবিধানিককভাবে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত (;)।

উপরোক্ত আইন দুটি বর্তমান সংসদ বাতিল করে দিয়েছে।

আইনের মাধ্যমে জাতির জনকের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা স্বল্পকালের জন্য কার্যকর ছিল। আমরা সাধারণত আইনের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা জানাই না, কিন্তু আইনের সর্বপারঙ্গমতা সম্পর্কে এক দারুণ অন্ধবিশ্বাস পোষণ করি।

ব্যক্তিবন্দনার অতিরঞ্জনে ও স্তাবকতায় একজন বড় মাপের মানুষও ছোট হয়ে যায়। টাঁকশাল থেকে সদ্যমুদ্রিত মুদ্রা বহুব্যবহারে ক্ষয় হয়, অনেক সময় মেকি বলে লোকের সন্দেহ হয়। আমাদের জীবনে যেসব মহৎ আদর্শকে আমরা উচ্চস্থান দিই তার সবগুলোই একজন ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্ন বলে প্রচার করায় কোনো লাভ নেই। ইতিহাসচর্চায় নানা কারণে দিকপরিবর্তন হয়। 'ইতিহাস এখন রিম্যান্ডে' শীর্ষক একটি ছোট কবিতায় আমি ইতিহাসের পুনর্লিখনের দুর্গতির কথা বলেছি। তাই বলে আমার কথায় ইতিহাসের পুনর্লিখন বা পুনর্মূল্যায়ন থেমে যাবে না। এ বিষয়ে উৎসাহীদের অভাব নেই। যাঁরা বৈশ্যবুদ্ধি রপ্ত করেছেন তাঁদের রচনায় ইতিহাসের দেবী ক্লিও পর্যন্ত অধোবদনে নীরব সম্মতি জানাতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশ বহু মত ও পথে বহুধাবিভক্ত এক দেশ। যাঁরা বায়ান্নতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইতেন না বা চাইলে বলতেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই কিন্তু রাষ্ট্রভাসানো বাংলা চাই না', যাঁরা ছয়-দফাকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর মনে করতেন, যাঁরা অস্ত্রের ভাষায় তার জবাব দিতে চাইতেন, যাঁরা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' রাখার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি করতেন এবং যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাঁদের উত্তরসূরিরা দেশের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। বাম আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন— যাঁদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন, কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বচিত্তে অংশগ্রহণ করেন এবং কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন— তাঁদের উত্তরসূরিরাও বাংলাদেশে রয়েছেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দলীয়করণ করতে গিয়ে বহু দেশপ্রেমিকের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করেছেন। গত ৫০ বছরের ইতিহাসকে একটি দলের সাফল্য-অসাফল্যের সঙ্গে একাত্ম করে দেখলে সেই বিভাজন বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না। এই বিরোধিতা-পরস্পরবিরোধিতার মধ্যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করার বা বাংলাদেশকে ভারতের প্রদেশ বানানোর মতো সব দারুণ অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। নজরুল ইসলাম জয় বাংলার কথা বললেও আমরা আজ জয় বাংলার মধ্যে জয় হিন্দ এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদের মধ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আমরা আজ এক দ্বিধাবিভক্ত জাতি, বিদ্বিষ্টভাবে বিভক্ত। নিত্যদিন সমঝোতার পরিবর্তে আমরা যে লাগাতার বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি করছি তার অবসান না হলে আমাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের অসম্পূর্ণ ও অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আছি।

SHEIKH MUJIB'S QUALITY OF LEADERSHIP

Dr. Kamal Hossain

Given the love that Bangabandhu had for the people of Bangladesh and they for him, it can be said that on 15 August 1975 it was not only his two surviving daughters, Hasina and Rehana who felt orphan, but it was the 75 million people of Bangladesh, who felt that they had that day lost someone whom they revered as their father.

Looking back, I think there are three qualities of his which would stand out, which gave to his leadership its unique character, and which united a nation of 75 million as one people. I was struck by Sir Thomas Williams singling out on the basis of his own association with Bangabandhu, one of the three qualities that I had singled out in my mind, and that is, of course courage, unparalleled courage. The second quality that stands out.,, as one looks back, was an intense nationalism, and the third was a total commitment to and deep love of the people. In talking about these three qualities I would like to recount three episodes, illustrating how these qualities were expressed.

Courage— I want to recount the episode with which our Chairman, Sir Thomas (1) is personally associated and where we were very close witnesses to the events about which I will talk. You will recall the so-called conspiracy case in which Bangabandhu was the principal accused. You will also recall the great Movement of 1969 which was surging ahead at the time.

The Government of the day sought to contain the Movement by calling a Round-table Conference of political leaders. The question had arisen of participation by Bangabandhu. Pressure was brought to bear on him while he was still an accused in the so-called trial that he should agree to attend the conference. Mr Abdus Salam Khan, one of the lawyers who was appearing for him, had conveyed messages of this kind to him. It was at that time that I remember receiving a message from Bangabandhu to come and see him in the court. When I met him, he said, "I want you to know that I can only go to any Round-table Conference when I and all those who are with me in the dock would be free men. There is no question of our participating in any deliberations, except on the basis that we are free men, and any pressure that may be brought upon me must be resisted."

I remember that was the time when we took up the threads of something that Sir Thomas had left behind, which was a constitutional challenge to the case in the High Court questioning the fundamental legality of the whole trial. We assured him that we would renew our endeavours in order to have the case quashed by the High Court. The Movement itself was gaining strength day after day. We were quite confident that if Bangabandhu were to go he would go the Round-table, as a free man or not at all. It is difficult to recreate the atmosphere of those days, when there was Martial Law in the country. Pressure was being put, threats were held out that if he did not go to the Round-table Conference, he may be killed at any moment. Thus, while the trial was proceeding, pressure was mounted, that if he did not go to the conference, the so-called hawks in the military would take over and they would gun everyone down. It was, I think, 13 February, while our legal efforts were going on, that Sergeant Zahurul Huq was actually gunned down in custody. He was one of the four accused—he was gunned down. Sergeant Fazlul Huq was injured. This was an actual cold-blooded gunning within the area where the

Agartala Case under-trial prisoners were kept in custody within the cantonment. This could only be taken to be a measure of intimidation.

Those of us who were seeing Bangabandhu everyday during those days remember that he did not flinch for a moment. He said : "Yes, our chest is always there to take any bullets that might come; but if the people of Bangladesh have to sit, if the Bengalee people are to sit in any Round-table Conference, its leader can only represent them as a free man." The rest is history. I remember the drama that was built up, the suggestion that he should go on bail or on parole. These suggestions were summarily rejected, although threats were held out that if he did not go, the Conference would breakdown and the hawks would take over. Everyday this was the refrain. Throughout all of this, his nerves held out in a way which was difficult to convey. He never for one moment considered that on an issue which to him was an issue of principle, there could be any question of compromise.

Finally, the announcement came that the case was being withdrawn as it was unconstitutional (The ground they took was, of course, one which has been raised in the petition which had been moved in the High Court by Sir Thomas)! This was in fact the result of the united people's movement and can be counted as one of its victories! Bangabandhu came out as a free man.

On coming out he said : "Before I go to the Round-table Conference I must first meet my people and take their mandate." It was in the historic meeting held at the Race Course, where those present can recall the feelings, the profound sense of nationalism that suffused the people on that day, when over a million people had assembled to give Bangabandhu his mandate. It was at that meeting that the title of "Bangabandhu" was conferred by the people who they had got him out of custody from the so-called Agartala Conspiracy Trial. This was not a title conferred by any individual, but by the millions of people assembled in that meeting the day after he came out from the Agartala Conspiracy Case.

The second quality that comes to mind is his intense nationalism. Of course, to talk of his intense nationalism, his role in giving to the Bengalee people the sense of being a nation, would mean talking for hours and filling volumes in print. I would, however, like to illustrate this by a specific episode in the early days of Bangladesh, while we were still passing through most difficult days immediately after liberation— when over 10 million people had to be rehabilitated after 9 months of the ravages of the liberation war, with millions of people killed; millions up-rooted from their homes, seeking rehabilitation; and the economy disrupted, with roads, rail, ports bearing the marks of indiscriminate destruction. Thus, when the country was in a state of economic vulnerability, the representatives of donors, led by the World Bank, had arrived and taken up the position that if Bangladesh did not take over a 'share' of the liabilities of former Pakistan, the donors would find it difficult to extend any assistance to Bangladesh. I remember we met together to appraise the situation— the need for assistance was acute. But there was here an issue of principle. How could the question of division of liabilities arise without first considering the question of division of assets. Indeed, by our estimate that if assets and liabilities were to be assessed, Bangladesh should be entitled to a net transfer, so that there could be no question of liabilities being taken over by Bangladesh, as was being proposed. We took the view after due consideration that this was an illegitimate form of pressure that was being put on Bangladesh, at a time when Bangladesh was vulnerable. After we discussed this matter with Bangabandhu, he took up the firm position that on an issue of principle, Bangladesh, as a sovereign nation, could not be imposed upon even thought it might be in a moment of vulnerability. We had 75 million people, each one of them had two hands, we had land and water; we would eke out our sustenance from this land. Bangabandhu said that if the donors persisted in their position,

they could leave tomorrow and we would not take aid. We would not accept aid on those conditions. That was nationalism in its most palpable form.

We went back, and faced an array of the donors' representatives, led by a Vice-President of the World Bank. The Finance Minister, Mr Tajuddin Ahmed, myself and Dr. Nurul Islam, the Deputy Chairman of the Planning Commission, said that we had given this matter due consideration. In our view, the position that they were taking was not warranted in principle or in law. It seemed to be a form of putting pressure on us at a moment of economic vulnerability. The Prime Minister had taken the position that we would stand on our own two feet and we will do without aid, if they would seek to impose upon us a condition which we thought was illegitimate. I remember the sense of disbelief on the faces of the representatives of the donors. They had not expected this. But they had not known Bangabandhu and the quality of the leader that Bangladesh had. The Vice-President of the World Bank went on to call on the Prime Minister. The Prime Minister, Bangabandhu, was much more brief. He said : "It has been reported to me that you have said you have to impose upon us a condition regarding 'liabilities' before you can give aid. Our people have won the independence of this country through their blood; if this country's sovereignty has to be protected, if its independence has to be protected, if we are to survive, it is the same strength of the people through which we will survive and we will do without your aid."

Three weeks later we got a letter from the Bank saying that they had re-considered the position and found that the position taken by Bangladesh was not without substance. They proposed a resumption of discussions. These things deserve to be better now, deserve to be better known to the people of Bangladesh. They merit wider dissemination throughout the Third World. We have read today of Tanzania and the kind of conditions that are

being imposed on them by I.M.F. We have read of other countries, Jamaica, which is today under pressure because they are in an economically vulnerable situation. It was Sri Lanka the day-before-yesterday; but there is an example in our own history of what leadership, which has got the strength of a united people behind it, can stand up and if it can stand up, it can make the mighty and the powerful bend down. This is a part of history. It is all in the records.

I will conclude with an episode about the third quality of Bangabandhu—that is his total commitment to the people and his deep love for the people. I remember in one of the earliest interviews which I had with the foreign Press in 1972, I was asked : "What do you think is Bangabandhu's greatest strength?" I said : "His love of the people." They said : "What is his greatest weakness?" and I said : "That also is his total love of the people." It was something which I had said spontaneously, but now looking back, I think that this was a sound perception. How was it a weakness? It was weakness in the way in which he forgave so many who did not deserve his forgiveness. How is it a weakness? A weakness in the total lack of any arrangements for personal security. Many remember his saying that there was no one in Bangladesh who could ever raise a hand against him, not knowing that there could be some criminals, that there could be those who although Bengalee by appearance, were really in the hands of some other force. This weakness, his love of the people, was of course his great strength. There was never any compromise so far as his love and commitment for the people was concerned. And people by which he meant the masses of the people. The image of the people that came up to him was that of the day-labourer, the boatman on the river, the landless peasant. These were the vast multitudes that make up Bangladesh. Through his love he tried to seek a change, a transformation of society in a peaceful way, carrying all the people with him; but one thing was

clear, if there was to be any conflict between the interests of the elite, between the interests of the vested interests and the interests of the masses—the landless peasant, the day-labourer, the ordinary people—his commitment would remain to the broad masses of the people with whom he identified himself. This is what underlay his great vision of a fundamental economic and social transformation. This is what animated him in the days when he was thinking in terms of a fundamental change in the villages that make up Bangladesh. What made the dominant and central part of that vision was the transformation of life in the villages of Bangladesh.

I think, I have said enough today. I can only say that Bangabandhu will continue to inspire (as Sir Thomas has said) not only those of us who knew him closely, but future generations, who I know will be inspired to realise his ideals and some day to realise in Bangladesh his vision *of Sonar Bangla,* a society free from exploitation.*

---

* Edited version of a speech given at a seminar held in a Committee Room of the House of Commons, London on 17 March, 1980. The seminar, which was presided over by Sir Thomas Williams, Q.C, M.P.(later Mr. Justice Williams), was organised by the Bangabandhu Society, Europe.

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

গাজীউল হক

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিরাট, বলা যেতে পারে এটি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই বিশাল প্রেক্ষাপটে ততোধিক বিশালত্ব নিয়ে বিরাজিত একটি নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একটি অপরটির সঙ্গে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে অন্যটি কল্পনাতে আসে না। একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত। তাই এসব বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে আসতেই হয় আমাদের।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের আগেই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের শাসকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে এ অঞ্চলের তখনকার যুব সমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষার চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল কোলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন— কাজী ইদ্রিস, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজশাহীর আতাউর রহমান, আখলাকুর রহমান আরও কয়েকজন। আলোচ্য বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের যুব সমাজের করণীয় কী? এর কয়েকদিন আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । 'আজাদে' প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. জিয়াউদ্দিনের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যদি একটি রাষ্ট্রভাষা হয় তবে গণতন্ত্রসম্মতভাবে শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখনকার প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার ধারক যুব সম্প্রদায়কে। এরই ফলশ্রুতিতে সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের বৈঠকটি আয়োজিত হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অসাম্প্রদায়িক যুব সম্প্রদায়ের সম্মেলন

ডাকতে হবে। বৈঠকের নেতৃবৃন্দ ঢাকা পৌঁছলেন, ঢাকার ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ঊনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হলো।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাড়িতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ এই সম্মেলনে বাধার সৃষ্টি করেছিল খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার এবং তার অনুগ্রহপুষ্ট গুণ্ডারা। ৭ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে জন্ম নিলো পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান। 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ'। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন—

"পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।"

এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। উচ্চারিত হয়েছিল নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকারের দাবি। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে ভাষার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তা সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার দিলেন লিয়াকত আলি খান। তিনি এবং রাজা গজনফর আলী খান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ব্যক্ত করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিন এবং তমিজউদ্দিন খান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। নাজিমুদ্দিন বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চায়।

ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ১১ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা বসলো। সভায় আপোষকর্মীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপোষ করতেই চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠলো, সরকার কি আপোষের প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে,

সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে।" ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপোষকর্মীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন— "সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না।"

১১ মার্চ হরতাল হয়েছিল, পিকেটিং হয়েছিল সেক্রেটারিয়েটের সামনে। সেখান থেকে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁর অপর সাথী অলি আহাদ, শামসুল হক সাহেব, শওকত সাহেব এবং অন্যদের সঙ্গে।

১১ মার্চের আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন আপোষের কথা তুললেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৮ দফা সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে যেহেতু বঙ্গবন্ধুসহ ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ ছিলেন, সেহেতু চুক্তির খসড়া কারাগারে নিয়ে গিয়ে তাতে তাঁদের সকলের সম্মতি নেওয়া হয়। শর্তানুসারে ১৫ মার্চ নেতৃবর্গ মুক্তি পেলেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন পুলিশি জুলুম ও সরকারের গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তাদের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। মুজিব জনতার মনের কথাটি ধরতে পারলেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভার সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সভা শেষে সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে তিনি ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা ঘেরাও করেছিলেন। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছিল, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেদিন সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

মুজিব তখন কারাগারে। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল। মিছিল করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল শত সহস্র ছাত্র-জনতা। মিছিল শেষে বেলতলায় জমা হয়েছে সবাই পরবর্তী ঘোষণার জন্যে। শামসুল হক চৌধুরী, গোলাম মওলা, আব্দুস সামাদ আজাদ-এর মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছেন শেখ মুজিব— খবর পাঠিয়েছেন তিনি সমর্থন জানিয়েছেন একুশের দেশব্যাপী হরতালের প্রতি। একটি বাড়তি উপদেশ, মিছিল করে সেদিন আইনসভা ঘেরাও করতে হবে, বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভার সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। আরও একটি খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি এবং মহিউদ্দিন সাহেব রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন করবেন। বেলতলায় দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি হরতাল হবে।

অনশনের নোটিশ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলায় স্থানান্তর করা হলো ১৬ ফেব্রুয়ারি। যাবার কালে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা

করলেন জনাব শামসুদ্দোহাসহ আরো অনেকে। তাঁদের বঙ্গবন্ধু জানালেন তাঁর এবং মহিউদ্দিন সাহেবের অনশনের কথা। অনুরোধ করে গেলেন যেন একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল মিছিল শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলাভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবসহ সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সভা হলো। সেই সভায় জানানো হলো একুশের হরতালের প্রতি দৃঢ় সমর্থন। একুশের রক্তাক্ত সংগ্রাম মুসলিম লীগ সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্ত বঙ্গবন্ধু তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুন্নত বিকশিত করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের নির্দেশ দিলেন। জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগ 'মুসলিম' শব্দটি কেটে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ছাত্রলীগে রূপান্তরিত হলো। ১৯৫৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে জয়পুরহাটে আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগে পরিণত হলো। বঙ্গবন্ধু '৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে এবং মিছিল শেষে সভায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন মাত্র দু'বছরের মধ্যেই। সারাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্রোতধারার সৃষ্টি করেছিলেন, যার পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, যার ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ; বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির ঘোষণা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নির্বাসন।

বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, ভাষার চেতনাকে বুকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি বিধানের সঙ্কল্প। বাঙালিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ চেতনা ছিল সর্বদা সক্রিয়। এ ব্যাপারে তিনি আমৃত্যু ছিলেন আপোষহীন, কঠোর। বাঙালি জাতি তাঁর এই অনন্যসাধারণ ভূমিকার কথা কখনো ভুলবে না।

৬-দফা বনাম ১-দফা

কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী

মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির অধীনে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন সম্মিলিত বিরোধী দল বা Combined Opposition Parties (Cop) সমর্থিত প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে পরাজিত করে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা তথাকথিত গণভোট (হ্যাঁ-না ভোট) অনুষ্ঠান করে আইয়ুব খান তাঁর আগের মেয়াদের পাঁচ বছরের শাসনকে জায়েজ করেছিলেন। ইতোপূর্বে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন জারি করে তথাকথিত বিপ্লব ঘটিয়ে তিনি ১৯৬০ সালের পূর্বের সময়কালের শাসনকে বৈধতা প্রদান করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রচার-অভিযানের সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে অনুষ্ঠিত জনসভা এবং পথসভাসমূহে মিস জিন্নাহ্ আইয়ুব খানের চাইতে অধিক সংখ্যক জনতাকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিই ছিল বেশিরভাগ জনগণের আস্থা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের কোন ভূমিকাই ছিল না। কেননা, ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা। 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর ভিত্তিতে বা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও আইয়ুব খান নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হতেন। এমনকি মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির অধীনে নির্বাচনেও মিস ফাতেমা জিন্নাহর চেয়ে তার প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান খুব বেশি ছিল না এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের ব্যবধান খুবই কম ছিল।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর আইয়ুব খান পুনরায় শাসন-ক্ষমতায় আসীন হলেন। সে সময় থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার বিষয়ে আমরা সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা

গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। আমি তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অর্ডন্যান্স ডেপোতে কর্মরত ছিলাম। আমার ধারণা, অনেক বাঙালি অফিসার ঠিক আমারই মতো চিন্তা-ভাবনা করত। সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে তথা সেনাবাহিনীতে কর্মরত নিম্নপদের বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থনের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ১৯৬৫ সালের প্রায় পুরো বছরটাই আমাদের পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব চাপা ছিল। তার প্রথম কারণ হলো, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সীমান্তে কচ্ছের রান এলাকায় ১৯৬৫ সালের প্রথমদিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ এবং দ্বিতীয়ত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিরূপণের লক্ষ্যে এই পুরো সময়টাতেই আমি নিজস্ব ভাবনায় নিবিষ্ট ছিলাম। পরিকল্পনার রূপরেখা ছিল, কোন এক নির্দিষ্ট রাতের নির্দিষ্ট সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল সেনানিবাসে একই সময়ে আমরা বাঙালিরা আক্রমণ চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একদিন সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ৬-দফা কর্মসূচি সম্বন্ধে প্রচারিত সংবাদ পড়লাম, যা তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে পেশ করেছিলেন। সম্ভবত সংবাদপত্রটি ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'দি মর্নিং নিউজ', যাতে শুধুমাত্র ১ থেকে ৬ পর্যন্ত দফাগুলো বিবৃত ছিল। কোন মন্তব্য বা সবিশেষ বর্ণনা ছিল না।

ধারাগুলো নিম্নরূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে, আইন পরিষদ হবে সার্বভৌম এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদ গঠিত হবে।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু মাত্র তিনটি বিষয়, যথা- প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা ব্যবস্থা, অন্য সকল ক্ষমতা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্য সময়ের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

৩. দেশের দু'টি অঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ হস্তান্তর-যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক

রিজার্ভ ব্যাংক থাকতে হবে এবং পৃথক রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি চালু করতে হবে।

৪. সব ধরনের কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায় করার ক্ষমতা অঙ্গরাজ্য-সরকারগুলোর হাতে থাকবে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট হিস্যা থাকবে যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গঠিত হবে এবং ফেডারেল সরকারের খরচ নির্বাহ হবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল প্রেরণসহ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দিতে হবে। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা-আয়ের দু'টি পৃথক হিসাব থাকবে এবং স্ব স্ব অঙ্গরাজ্য তা নিয়ন্ত্রণ করবে। অঙ্গরাজ্যগুলো সমান হারে অথবা কোন সম্মত হারে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাবে। দেশীয় পণ্য এক অংশ থেকে অন্য অংশে অবাধে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬-দফা কর্মসূচির অন্তর্নিহিত ভাবধারা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে আকৃষ্ট করল এবং আমার ধারণা হলো যে, বাঙালিরা এই কর্মসূচি আন্তরিকভাবে সমর্থন করবে, যা তারা আশাতীতভাবে করেছিল। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মুজিব ভাইয়ের অন্তরে এক-দফা অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্রিয়াশীল ছিল এবং ৬-দফা কর্মসূচি উপযুক্ত পটভূমি হিসেবে এক দফায় উন্নীত হতে সাহায্য করবে। অতি অল্প শব্দ ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত কর্মসূচিটি স্বাধীনতার সমর্থনে সরাসরি তেমন কিছুই ব্যক্ত করেনি। কিন্তু কারো মনে সন্দেহ রইল না যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখেই ৬-দফা কর্মসূচি দিয়েছেন। শুধু পাকিস্তানিদের তিনি একটা সুযোগ দিয়েছিলেন, ৬-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে পাকিস্তানের অখন্ডতা আপাততঃ অক্ষুণ্ন রাখতে, নতুবা এক-দফার দিকে দ্রুত ধাবমান হতে। আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে পাকিস্তানিরা কিছুতেই ৬-দফা কর্মসূচি মেনে নিতে সম্মত হবে না, যা পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল। সুতরাং এক-দফা বাস্তবায়নে আরও সঙ্ঘবদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছিল। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আমার আস্থা আরো গভীর হয়েছিল।

৬-দফা কর্মসূচি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই আইয়ুব খানের সহযোগীরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে ৬-দফা কর্মসূচির বিরূপ সমালোচনামূলক বিবৃতি প্রদান করতে শুরু করল। যার ফলে কর্মসূচিটি অধিকতর জনপ্রিয় হতে থাকল। ইত্যবসরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা কর্মসূচি যথারীতি গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি পুস্তিকা

প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানব্যাপী ঝটিকা সফরের মাধ্যমে জনসভা করতে লাগলেন। জনসভাগুলিতে নজিরবিহীন জনসমাগম হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ৬-দফা কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করে। সংবাদপত্র পড়ে এবং লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি বুঝতে পারছিলাম কী ঘটতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু দ্রুত বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গকে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ প্রদর্শনের জন্য বাঙালি প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খানও জানতেন কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু দেওয়ালের লিখন না পড়ে এবং রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে তিনি সামরিক কায়দায় প্রতিঘাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি গৃহযুদ্ধের কথা বলে অস্ত্রের ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে ভয় দেখালেন। ৬-দফার মতো পুরোদস্তুর একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের অসার ও অরাজনৈতিক বিস্ফোরণ বাঙালিরা মেনে নেয়নি। দেশপ্রেমিক বাঙালিরা যুক্তি দেখালো যে ৬-দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির অতিরিক্ত কিছুই নেই। ৬-দফা কর্মসূচি মেনে নিলে পাকিস্তান বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতো এবং একই সঙ্গে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থসমূহ যা দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রশাসনিক দমননীতির কারণে উপেক্ষিত হয়েছিল, তা রক্ষা করা যেতো। যে আকারের স্বায়ত্তশাসন পেলে ১৯৫৬ সালে বাঙালি সন্তুষ্ট হতো, ১৯৬৬ সালে তা চায়ের কাপের সমতুল্য মনে হয়েছিল। কারণ, ৬-দফা কর্মসূচিতে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও, চরম প্রকৃতির আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ ছিল। এ কথা মানতেই হবে যে, যদি রাজনৈতিক সমস্যাবলী যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ণ করা না হয় এবং যথাসময়ে সমাধান করা না যায়, তাহলে সেগুলো আরো বড় আকার ধারণ করে বিবদমান শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে দারুণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং এতদূর গড়ায় যে পরে যার আর কোন মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে না। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মেনে নেয়নি। আইয়ুব খান তো স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসীই ছিলেন না এবং এটাকে অর্থহীন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয় হিসেবে মন্তব্য করতেন। সুতরাং ১৯৬৬ সালে কঠিন শর্ত-সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলো আইয়ুব খানকে। ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি বাঙালিদের অবিচল বিশ্বস্ততা লক্ষ্য করে, আইয়ুব খান এর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠলেন। সে কারণে গৃহযুদ্ধের অজুহাত খাড়া করে অস্ত্রের ভাষায় ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু বাঙালি ভ্রূকুটি তথা হম্বি-তম্বিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়নি।

আইয়ুব খান ও তদীয় গভর্নর মোনায়েম খানের ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও বাঙালিরা ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি দৃঢ় সমর্থন অব্যাহত রাখল। এই দুই ভদ্রমহোদয় একজন

সম্রাট এবং আরেকজন জায়গীরদার হিসেবে একটি অসম পার্টনারশীপ গঠন করেছিলেন। আইয়ুব খান মুকুট পরে সম্রাটের ভূমিকায় ছিলেন এবং মোনায়েম খান প্রভুর পাদুকাদ্বয় মার্জনের ব্রত থেকে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে কোন কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানের অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় বারোটিরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। উল্লেখিত মামলাসমূহের গ্রেফতারী পরোয়ানা কার্যকর করতে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে মোনায়েম খানের নির্দেশে প্রাদেশিক সরকার যে নিপীড়নমূলক এবং নীতিবিবর্জিত পন্থা অবলম্বন করেছিল তাতে সকল মহল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। খুলনায় এক জনসভায় বক্তব্য প্রদানের পর ঢাকায় ফেরার পথে যশোরে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের ভিত্তি ছিল ঢাকার একটি জনসভায় রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে ঢাকা থেকে জারি করা একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা। খুলনা থেকে ঢাকা ফেরার পথে যশোরে তাঁর গতিরোধ করে গ্রেফতার করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ঢাকায় ফিরে আসার পর খুব সহজেই ঐ ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা যেতো। এই গর্হিত কাজের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে হয়রানী ও উৎপীড়ন করা। কিন্তু এর ফলে তিনি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যশোর সদরের এসডিও মহোদয়ের কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা সদরের এসডিও মহোদয়ের নিকট জামিনের প্রার্থনা জানালে তা না-মঞ্জুর হয়। কিন্তু একই দিনে ঢাকার মাননীয় দায়রা জজ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। সিলেট থেকে জারি করা এক গ্রেফতারী পরোয়ানার ভিত্তিতে ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ঢাকার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়। সিলেট সদরের এসডিও মহোদয় তার জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিলেটের বিজ্ঞ দায়রা জজ তাঁর জামিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ময়মনসিংহ থেকে জারি করা অপর একটি ওয়ারেন্টের বলে তাঁকে সিলেট জেল গেটেই পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং সেখান থেকে ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হায়। ময়মনসিংহ সদরের এসডিও মহোদয় তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করলে, বিজ্ঞ দায়রা জজ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে শেখ মুজিবকে পর্যায়ক্রমিক গ্রেফতারের মাধ্যমে আইয়ুব-মোনায়েম জুটি যে নাটকের অবতারণা করেছিল এবং যার উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবকে কঠোর শাস্তি দেয়া, তা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে শেখ মুজিবকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। ১৯৬৬ সালের ৯ মে তারিখে ডিপিআর বা ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস্-এর অধীনে তাঁকে শেষবারের মতো গ্রেফতার করা পর্যন্ত প্রতিদিন সংবাদপত্রসমূহ বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি নাটকের সংবাদ পরিবেশন করে তাঁকে মহানায়কে পরিণত করেছিল।

ছয়-দফা থেকে অসহযোগ : বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠতম সময়

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

ভূমিকা

জন্মিলে মরিতে হয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। তবে স্বাভাবিক মৃত্যুই কাম্য। কোনো ব্যক্তি দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির খুন মানবিক মূল্যবোধের, প্রচলিত আইনের বর্বরতম লঙ্ঘন। তাই কেউ যদি এরকম ঘৃণ্য কাজ করে তার আইনানুগ যথাযথ বিচার করতেই হয়। অন্যথায় যাদের বিচার করার কথা তারা ঐ জঘন্য কাজ যে করল তার অপরাধের ভাগি হয়ে যান। আর যাকে খুন করা হলো, তিনি যদি জাতির শীর্ষতম নেতা এবং দেশটির স্থপতি হন, তবে তাঁর খুনের বিচার না হওয়া জাতির কপালে জ্বলন্ত কলঙ্ক। তাঁর খুনের বিচার না হলে সাধারণ মানুষ যে সুবিচার পাবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে খুন করার পর ৩২ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত খুনীদের বিচার হয়েছে, কিন্তু প্রদত্ত রায় এখনও কার্যকর করা হয়নি। এ কেমন বাংলাদেশ! অকৃতজ্ঞ, স্বার্থান্ধতা, লোভ ও লালসায় যাদের চোখ অন্ধ, কান বন্ধ এবং বিচার-বিবেচনা আচ্ছন্ন, তারা এই গভীর অন্ধকার অধ্যায় থেকে জাতির উত্তরণ ঘটতে দেয়নি। ইতিহাসই এদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করে দিবে, কেননা সত্য অবশেষে ইতিহাসই সঠিকভাবে উদ্ঘাটন করে এবং যার যা প্রাপ্য তা নির্ধারণ করে দেয়। এ সত্য বোঝার শিক্ষা ও দূরদর্শিতা না থাকলে নিজের অনুকূলে ইতিহাস বানানোর চেষ্টায় কেউ কেউ লিপ্ত হতে পারে। এই প্রবণতা বাংলাদেশে প্রকটভাবে বিদ্যমান। ক্ষমতা হাতে থাকলে হামবড়া ধারণার প্রচারণা এবং সুযোগ-সুবিধা বিতরণের মাধ্যমে অনেককে সাময়িকভাবে কাছে টানা যেতে পারে, কিন্তু সত্য পাল্টানো যায় না। বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসই তার যথাযথ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে। আর ক্ষুদ্রজনেরা ইতিহাসের প্রান্তজন হিসেবেই চিহ্নিত হবেন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সামনে বঙ্গবন্ধু হত্যা-বিচারের রায় কার্যকর করে জাতিকে কলঙ্ক-মুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত যারা বিদেশে পালিয়ে

রয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একই সাথে জেলে জাতীয় চার নেতার (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান) হত্যার সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করতে পারে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

একজন ব্যক্তির জীবনে উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কোনো একটা সময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় উজ্জ্বলতর হতে পারে। আর বিশাল মাপের মানুষের জীবনে অনেক অনেক অর্জনের মাঝেও একটি সময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় উজ্জ্বলতর হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সময়কে তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমার বিবেচনায় নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় ছিল দীর্ঘ ২১-বছর জেল-খাটার পর ছাড়া পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য ভেঙ্গে ফেলে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সম-অধিকারের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানের সময়। অবশ্যই তাঁর জীবনের অতীত সংগ্রাম তাঁকে ঐ অবস্থানে পৌঁছার জন্য তৈরি করেছে, সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বপালন এবং সেই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর একজন বিশ্বনেতা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান এখনও রেখে যাচ্ছেন। অবশ্যই এ সকল কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব কিছু কম নয়। এরকমভাবে বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় হিসেবে ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা ঘোষণা থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণে তাঁর বজ্রকঠিন, দূরদর্শী এবং জাতির স্বার্থে নিবেদিত নেতৃত্বদানের সময়কে চিহ্নিত করতে চাই। একদিন একটি বক্তৃতা দিয়েই জাতীয় নেতা-নেত্রী হওয়া যায় না। বঙ্গবন্ধু জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির স্বার্থের অনুকূলে তাঁর আন্দোলন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সোপান বেয়ে। চলার পথে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। জেল খেটেছেন বহুবার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা মামলায় জড়ানোও হয়েছিল তাঁকে। এই লেখায় তাঁর জীবনের যে সময় আমি শ্রেষ্ঠতম সময় বলে চিহ্নিত করেছি ঐ সময়ে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কর্মসূচি— ১৯৬৬-এর ছয়-দফা ও ১৯৭১ মার্চের অসহযোগ আন্দোলন— নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

১৯৬৬ সালে প্রদত্ত ছয়-দফার প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১। বাঙালির পরাধীনতার সর্বশেষ অধ্যায়। এর আগে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসন-শোষণবিরোধী আন্দোলনে বাঙালির স্থান ছিল সামনের সারিতে। সাতচল্লিশে ইংরেজ গেল বটে তবে যে ভূখণ্ড নিয়ে আজকের বাংলাদেশ গঠিত তৎকালীন সেই পূর্ববাংলার ভাগ্যের খুব একটা হেরফের আর ঘটলো না। এতদঞ্চলের বাঙালি বাঁধা পড়ে গেল নতুন এক দাসত্বের শেকলে।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফসল সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান শুধু ভৌগোলিক অর্থেই দুস্তর ছিল না। কেবল ধর্মীয় মিলটুকু ছাড়া অনতিক্রম্য ব্যবধান ছিল নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। এবং যতই দিন গেল সেই ব্যবধানগুলোই চরম বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রনীতির প্রবল চাপে অসহনীয় হয়ে উঠলো প্রায় সকল বাঙালির জন্য। আর তারই পরিণামে ভেঙ্গে পড়লো উপমহাদেশের অস্বাভাবিক সেই রাষ্ট্র।

অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এতদঞ্চলের বাঙালি মুসলমান সোৎসাহে, সাগ্রহে যোগ দিয়েছিল। বিপুল প্রত্যাশা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা পথ খুলে দেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আর অগ্রগতির— পাকিস্তানের দুটি অংশ সম-অধিকারের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবে, আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে উভয় অঞ্চলে সমানভাবে। কিন্তু দেখা গেল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে ফারাক বড় বেশি এবং ক্রমবর্ধমান।

বাঙালির মোহভঙ্গের সেই প্রক্রিয়ার সূচনা একেবারে শুরুতেই। নতুন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়েও বাঙালিরা দেখলো কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপিত হলো ঢাকার বদলে করাচীতে। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হলো মূলত : অবাঙালি চক্র ও তাদের গুটিকয়েক উচ্ছিষ্টভোগী বাঙালি নামধারী ব্যক্তিবর্গ। একই প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে নেয় একই বাঙালিবিদ্বেষী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এদের মধ্যে ছিল বৃহৎ সামন্তভূস্বামী, পদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং শিল্পপতি ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। সত্যিকার অর্থে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ওই গোষ্ঠীতে ছিল না বললেই চলে। অপরদিকে বিভাগপূর্ব পূর্ববাংলার স্থানীয় এলিটগোষ্ঠী প্রায় সবাই ছিল বাঙালি হিন্দু ও অবাঙালি মাড়োয়ারী যারা দেশভাগের পরপর সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ ভারতে পাড়ি জমায়। এতে করে পূর্ববাংলার প্রশাসনে, শিক্ষাঙ্গনে এবং অর্থনীতিতে এক ধরনের শূন্যতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রযন্ত্র অনুকূল হলে সুদীর্ঘকালের পরাধীন বাঙালি রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতো। কিন্তু আগেই বলেছি, বাঙালিদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। এক পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোয় আধিপত্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর পাশে বাঙালি জাতিসত্তার সম্মানজনক সহ-অবস্থান সম্ভব ছিল না।

সংঘাতের শুরু রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নেই। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতিসত্তার কেন্দ্রীয় উপাদান। পাকিস্তানের গরিষ্ঠ অধিবাসীর ভাষা বাংলার দাবিকে অস্বীকার করে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্তকে রুখতে গিয়ে, পাকিস্তানে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। অতঃপর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এগিয়ে

চলে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এই পথেরই একটি মাইলফলক ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার ভিত্তিতে পূর্ববাংলায় নির্বাচন, যাতে ক্ষমতাসীন কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি ঘটে। কিন্তু তাতে বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বোধোদয় হয়নি। সেজন্যই দেখি ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বাঙালির দীর্ঘকালের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হলো সেই একই চক্রান্তের মাধ্যমে। পূর্ববাংলার দাবি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্র এবং যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক শাসন কাঠামো। কিন্তু নতুন সংবিধানে ঘটলো ঠিক উল্টোটা। এতেও হালে পানি না পেয়ে পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র জারি করলো সামরিক শাসন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে।

বলাবাহুল্য, এতে করে পূর্ববাংলার ভাগ্যের তেমন ইতরবিশেষ হলো না। আগেই বলা হয়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে বরাবরই চালকের আসনে ছিল। আর সেই আমলাতন্ত্রে বাঙালির অবস্থান ছিল নগণ্য। অথচ রাষ্ট্রীয় বাজেটের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ ব্যয় হতো বিশাল সামরিক বাহিনীর পেছনে। বিপুর অঙ্কের এই অর্থব্যয়ের সুফল প্রায় পুরোটাই পেতো পশ্চিম পাকিস্তান। এমনকি অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত পূর্ববাংলার প্রতিরক্ষার কোনো সুব্যবস্থাও এই বিশাল সামরিক বাজেট থেকে করা হয়নি। এই সত্যটি বড় নির্মমভাবে ধরা পড়ে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। সচেতন বাঙালির বুঝতে বাকি রইলো না যে, বিদ্যমান পাকিস্তানী রাষ্ট্র-কাঠামোর অধীনে পূর্ববাংলা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চিরস্থায়ী আয়ের উৎস এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বন্দি বাজার হিসেবেই থেকে যাবে। একেবারে চিরাচরিত ঔপনিবেশিক সম্পর্ক দুই অঞ্চলের মধ্যে গড়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পিত তত্ত্বাবধানে। ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রকার বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান।

দাসত্বের এই নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও তাই পূর্ববাংলায় অব্যাহত ছিল পুরো সামরিক শাসন আমলেও। একই ধারাবাহিকতায় তৈরি হয়েছিল ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের একেকটি মাইলফলক বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রযাত্রায়। এদিকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ববাংলায় বিরোধী-দলীয় রাজনীতিও হয়ে পড়ে দিশেহারা। সামরিক শাসন আমলে আইয়ুব খানের নানা ধরনের আক্রমণাত্মক তৎপরতার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো কোনোরকমে টিকেছিল মাত্র। তবে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছিল, শক্তি অর্জন করছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক নেতৃত্বে। সেই ১৯৫৩ সাল থেকেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলটির হাল ধরে রেখেছিলেন তিনি। আর ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বলতে গেলে আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখার পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর।

ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে এবং তাঁর ওপর জাতীয় নেতৃত্বের যে বিশাল দায়িত্ব বর্তায়, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিব লাহোরে নিখিল পাকিস্তান বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশে তাঁর ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। উপস্থিত অন্য কেউই তাঁর প্রস্তাবকে আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত না হওয়ায় তিনি লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর ৬-দফা প্রস্তাব 'ছয়-দফা—আমাদের বাঁচার দাবি' এই শিরোনামে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন। ছয়-দফায় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল তা এখানে দেওয়া গেল। (১৯৬৬ সালে বিভিন্ন দফা যেভাবে রচনা করা হয়েছিল, ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময়ে কোথাও কোথাও তার কিছু পরিবর্তন করা হয়। ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে চারটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করার কারণে কোনো কোনো প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন এমনিতেই দেখা দেয়। যা হোক, বিভিন্ন প্রস্তাবের মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো।)

প্রথম দফা : লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারভিত্তিক ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সংসদ প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। (পরবর্তী 'লাহোর প্রস্তাবের' উল্লেখ বাদ দেওয়া এবং ফেডারেল সংসদ অঙ্গরাজ্যগুলির জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের গঠনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

দ্বিতীয় দফা : শুধু বিদেশ নীতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ফেডারেল সরকারের দায়িত্বে থাকবে। বাকি সব বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারভুক্ত হবে।

তৃতীয় দফা : যদি এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যায় যাতে দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি পাচার রোধ করা যাবে, তবে সারা দেশের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। অন্যথায় (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য) দুটি আলাদা মুদ্রার ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ দফা : কর নির্ধারণ ও আদায় অঙ্গরাজ্যসমূহের এখতিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারকে নির্ধারিত অর্থ দেওয়া হবে।

পঞ্চম দফা : অঙ্গরাজ্য দুটি আলাদা আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

ষষ্ঠ দফা : অঙ্গরাজ্যগুলো সমস্ত আধাসামরিক-বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব রাখা হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রস্তাব বিধৃত হয় এবং ষষ্ঠ দফা ছিল নিরাপত্তা বিষয়ক।

অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহের আওতায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় অঙ্গরাজ্যগুলোকে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানকে। বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা ফেডারেল সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হলেও ষষ্ঠ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাও বহুলাংশে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে বর্তায়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য অঙ্গরাজ্যগুলোর দায়িত্বে থাকার প্রস্তাবের দ্বারা বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ফেডারেল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকাই তাই থাকলো না।

আইয়ুব খান ও তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানি সহযোগীরা ছয়-দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রস্তাব এবং দেশকে ধ্বংস করার চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। আইয়ুব খান হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বাঙালির এই প্রস্তাবিত পথ দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে এবং ভারত পূর্ব-পাকিস্তান দখল করে নিবে। তিনি 'অস্ত্রের ভাষা' ব্যবহারের হুমকি দেন এবং চক্রান্তকারীদের 'স্বপ্নবিলাস চুরমার' করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে ছয়-দফা লাহোরে উপস্থাপিত হওয়ার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সারা দেশজুড়ে শুরু হয় ছয়-দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার বিপুল কর্মতৎপরতা। তিনি জানতেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে এ কাজে বেশি সময় দেবে না। বাস্তবে ঘটলোও তাই। শুধু শেখ মুজিবই নন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে জেল-জুলুম-নির্যাতনের শিকার হলেন আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী। বাদ পড়লেন না এমনকি দ্বিতীয় স্তরের নেতাকর্মীরাও। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো তাতে। শহরের মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে ছয়-দফা তথা বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীসহ কোটি জনতার মাঝখানে, দেশের সর্বত্র। আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয়-দফার পক্ষে ও নিপীড়ন— নির্যাতনের বিরুদ্ধে পালিত হলো দেশব্যাপী সফল হরতাল, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল অভূতপূর্ব।

দিশেহারা শাসকগোষ্ঠী দমননীতির শেষ উপায় হিসেবে শেখ মুজিব ও আরো কয়েকজন বাঙালির বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা সাজায়। এটিই ইতিহাসখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা। কিন্তু তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এর পরদিন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত গণসংবর্ধনায় শেখ মুজিব ভূষিত হন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে। একই সাথে টলে উঠলো লৌহমানব সামরিক-শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের তখত। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ বিদায় নিলেন তিনি তাঁর উত্তরসূরি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

অতঃপর পাকিস্তানি রাজনীতির দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে থাকলো দ্রুতগতিতে। নতুন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে গোটা দক্ষিণ বাংলায় প্রাণ হারায় দশ লাখের মতো মানুষ, ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও ছিল অপূরণীয়। এই মহাদুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি ত্রাণকার্য পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকারের মর্মান্তিক অবহেলা ও ঔদাসীন্য আরেকবার প্রমাণ করলো পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তির কাছে বাঙালির অবস্থান ছিল কত অকিঞ্চিৎকর। আরো প্রমাণিত হলো যে, টিকে থাকার লড়াইয়ে বাঙালির জয়ী হতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো কত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর সারা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন, যা ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম সে রকম নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছয়-দফার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল এবং এটি ধরে নেয়া হলো যে, ছয়-দফার জনপ্রিয়তা যাচাই হবে ঐ নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা। গণরায় ওই কর্মসূচির পক্ষে, না বিপক্ষে তা দেখার জন্য দেশজুড়ে প্রতীক্ষা ছিল সেটাই। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় বাঙালিবিদ্বেষীদের সকল প্রচারণা ও চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিল এক ফুৎকারে। শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ভোট পেয়েছিল আওয়ামী লীগ।

কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না পাকিস্তানি শাসকচক্র। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন করার কথা ছিল আওয়ামী লীগের। কিন্তু যে রাষ্ট্রের জন্ম ও গঠন প্রক্রিয়াই ছিল অস্বাভাবিক সেখানে স্বাভাবিকতার স্থান কোথায়? সে জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তার সমমনাদের আপত্তির কারণ দেখিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া ৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দুদিন স্থগিত ঘোষণা করেন। এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অর্থাৎ বাঙালির বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যান্ডেটকে অস্বীকার করলো পাকিস্তানি শাসকচক্র। তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে তীব্র রোষে ফেটে পড়লো পূর্ব বাংলার আপামর জনতা। বিগত ২৪ বছরের শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের ফলে জমে ওঠা অগ্নিগর্ভ-ক্ষোভ বিস্ফোরিত হলো ১ মার্চের ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর পরই।

মার্চ ১৯৭১ : অসহযোগ

শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর ডাকে এবং তাঁর নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন, রাজধানীতে সর্বত্র এবং দেশের অন্যত্র স্বতঃস্ফূর্ত জনতার ঢল নেমে এলো রাস্তায়। বিক্ষোভ মিছিল মিটিং আর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো সারা দেশ। সরকার সান্ধ্য-আইন জারি করে লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাস ছুড়ে, ব্যাপক ধড়পাকড়

করে কোনোভাবেই বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে পারলো না। যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, যে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত, দমননীতি চালিয়ে তাকে নির্বাপিত করা আর সম্ভব ছিল না কারো পক্ষে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তখন মুক্তিপাগল সকল বাঙালি ঐক্যবদ্ধ। তিনি ততক্ষণে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, আস্থা অর্জন করেছেন সর্বস্তরের মানুষের। সর্বোপরি নির্বাচনে বিপুল বিজয় তার নেতৃত্বকে এনে দিয়েছে সর্বজনস্বীকৃত আইনগত ভিত্তি। বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বহুকাল থেকে ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাঁর ছিল মানুষকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ 'ক্যারিশমা', ভালোবাসা দিয়ে তাদের জয় করার অপূর্ব ক্ষমতা। সব মিলিয়ে একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় বান ডাকলো। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এলো কোটি জনতা। আর সকলের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালেন এক জননন্দিত নেতা— এক হাতে তাঁর বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য।

৭ মার্চে বেজে উঠলো সেই রণতূর্য। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের শেষ ফালগুনের সেই প্রখর রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ-জনতা অপেক্ষা করে থাকলো সেই বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা শোনার জন্য। অবশেষে তিনি এলেন এবং ১৮ মিনিটের বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা ওইদিন তিনি দিলেন না, যা অনেকেই আশা করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমিও সেদিন জনতার মধ্যে ছিলাম। আমার মনে পড়ে অধিকাংশ মানুষ "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই উচ্চারণকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে লড়াইয়ের ঘোষণা বলেই ধরে নিয়েছিল।

ফলে পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্বকে তারা আর মেনে নিতে রাজি ছিল না। আমজনতা তো বটেই, এমনকি অফিস-আদালত, দোকানপাট, ব্যাংক-বীমা, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও নির্দেশ পালিত হতে লাগলো। ১৪ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ৩৫টি নির্দেশ জারির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কার্যত বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সকল ক্ষেত্রেই— যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা, যোগাযোগ, উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, কর, খাজনা, বেতনভাতা ও পেনশন প্রদান ইত্যাদিসহ রাষ্ট্রপরিচালনার সকল অঙ্গই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার আওতায় এসে গেল স্বচ্ছন্দে, সাবলীলভাবে। মোটকথা বাঙালির জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আর বঙ্গবন্ধু পরিচালিত কাঠামোর বাইরে থাকলো না। এমনকি সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার ঢাকা বেতারে বাধাপ্রাপ্ত হলেও পরের দিন তার রেকর্ডকৃত ভাষণ কর্মচারীদের চাপে কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে বাধ্য হয়।

বাঙালির সর্বাত্মক এই অসহযোগ আন্দোলনকে পাকিস্তানি শাসকচক্র মোকাবিলা করার চেষ্টা করে দুভাবে। একদিকে তারা দমন-পীড়নের মাত্রা ও পরিধি

বাড়াতে থাকে, এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লোকদেখানো আলোচনার একটা বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যায়। আগের গভর্নর এস এম আহসানকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় নিয়ে আসে 'বেলুচিস্তানের কসাই' বলে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে। কিন্তু ঢাকা হাইকোর্টের কোনো বাঙালি বিচারপতিই টিক্কা খানকে শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজি না হওয়ায় তাকে সামরিক আইন-প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সকল সরকারি কর্মচারীকে অসহযোগ পরিত্যাগ করে পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলে কেউ তা পালন করেননি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রতারণামূলক আলোচনার ভান করে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। প্রথমে অস্বীকার করে পরে ২১ মার্চ আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ভুট্টোও ঢাকা আসেন।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। পূর্ববাংলায় দিনটি পালন করা হয় প্রতিরোধ-দিবস হিসেবে। পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ছয়-দফা দ্রুতই পরিণত হয় এক দফায় অর্থাৎ স্বাধীনতাই হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির একমাত্র লক্ষ্য। আর পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতিনিধি ইয়াহিয়া ও তার দোসররা পূর্ব বাংলায় চূড়ান্ত আঘাত হানার সকল সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এতদিন আলোচনার ছদ্মবেশে ঢাকায় কালক্ষেপণ করে চলছিল। সেই লক্ষ্য হাসিল করে ২৫ মার্চের বিকেলে ইয়াহিয়াচক্র ঢাকা ত্যাগ করে। তারপর রাতের আঁধারে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া শ্বাপদবাহিনী মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার ঘুমন্ত নগর, শহর, বন্দরে। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাঙালি রুখে দাঁড়ালো, হানল প্রতিঘাত। শেষ হলো বাঙালির অসহযোগ পালা, শুরু হলো সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ।

উপসংহার

এই ছিল একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সিকি-শতাব্দীবিস্তৃত প্রেক্ষাপট। রাষ্ট্রীয়-জীবনে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় শুরু থেকে। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাঙালির অভিযাত্রা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পানে এগিয়ে গেছে। ত্যাগে তিতিক্ষায় উজ্জ্বল, অশ্রুতে ভেজা, রক্তেস্নাত ছিল সে অভিযাত্রা। সেই যাত্রাপথের বিভিন্ন পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন জনতার কাফেলার সামনের সারিতে। ক্রমান্বয়ে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে জননন্দিত অবিসংবাদিত নেতায়, বঙ্গবন্ধু হিসেবে জাতির স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে, মুক্তিসংগ্রামের মহানায়কে এবং বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপকার হিসেবে।

আরো কিছু কথা : স্বাধীনতা ও সম-সুযোগের সমাজ সৃষ্টি

ঊনিশ শ' একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে সেই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। ঐ একাত্তরের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তি সম্ভব হয় এভাবেই। কিন্তু যে মুক্তি সংগ্রামের উল্লেখ তিনি করেছিলেন সেই একই ভাষণে, সে মুক্তি তো আজও আসেনি। অনুমান করি, মুক্তি বলতে তিনি দারিদ্র্য ও বৈষম্য পীড়িত লাঞ্ছিত আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তিকেই বুঝিয়েছিলেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য লাঘব রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই প্রণীত আমাদের সংবিধানে। কিন্তু আজও সে লক্ষ্যে অগ্রগতি তো হয়ইনি বরং অধোগতি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বেড়েছে; আয়-বিবেচনায় দরিদ্রদের সংখ্যা আজও ছয় কোটি। মানব-মর্যাদাহীনতায় ভুগছেন এদেশের আরো অনেক অনেক বেশি মানুষ।

বঙ্গবন্ধুকে এই বাংলায় এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির যথাযথ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে বলিষ্ঠভাবে এগুতে হবে ওই মুক্তি অর্জনের পথে। মনে রাখতে হবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য মানবতার বিরুদ্ধে বড় অপরাধ। দরিদ্র মানুষকে মুক্তি দিতে হবে মানবাত্মার সেই নিত্য অপমান থেকে। আমরা বর্তমান প্রজন্ম যদি সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হই, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে দায়ী যেমন থাকবো বঙ্গবন্ধুর কাছে, তেমনি থাকবো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও। ক্ষমা করবে না ইতিহাসও। দেশের ও জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জনের মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু তাঁর আরাধ্য সোনার বাংলায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন, ভাস্বর হয়ে থাকবেন। একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২

২. আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-৭১), সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩

৩. Syed Humayan, Sheikh Majibi 6-Point formula : An Analytical Study of the Breakup of Pakistan. Royal Book Company, Karachi, 1995

জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ: একটি অনুপুঙ্খ পাঠ

শামসুজ্জামান খান

এক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ১৯৭১ প্রদত্ত ইতিহাসের অনন্য ভাষণটি অধিকার-বঞ্চিত বাঙালির শত সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ। মাত্র উনিশ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি এতো কথা অমন অমোঘ তীক্ষ্ণতা, সাবলীল ভঙ্গি, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু গভীরভাবে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া ভাষায় কেমন করে বলতে পারলেন সে এক বিস্ময় বটে! ভাষণের মূল কথা যদি খুঁজি তাহলে দেখা যায় পূর্ব-বাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস ও অধিকারহীনতার বিষয় এতে দীপ্র হয়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমেই এ অবস্থা থেকে বাঙালির সার্বিক মুক্তি সম্ভব— এই বক্তব্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতাশৈলীর অতুলনীয় ভঙ্গিতে কখনও আবেগ, কখনও যুক্তি, কখনও প্রশ্ন বা ইচ্ছাকৃত জোরালো পুনরুক্তির মাধ্যমে সোচ্চার, কিংবা বিশেষ স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই কৌশলময় ভাষা বা ইঙ্গিতে শ্রোতাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

কোনো দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় বিপুল মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার চাপ ও বিদ্যমান ঘটনা প্রবাহের মিথষ্ক্রিয়া কোনো দূরদর্শী ও গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে মূলধারার মুখপাত্র বা মুখ্যচরিত্র করে তোলে : অথবা কোনও দমিত, দলিত, নিগৃহীত জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্যারিশম্যাটিক মূল নেতাই জনগণের মানস-চেতনার স্তর ও বাস্তবিক ভেতর তাগিদের সঙ্গে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস-ধারণা-বিবেচনা ও সময়জ্ঞানকে অন্বিত করে জাতীয়তাবাদী-আন্দোলন বা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছিল।

দুই

দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত, চিন্তা-চেতনায় পশ্চাৎপদ, এককালের ব্রিটিশ-ভারতের হিন্টারল্যান্ড এবং পরে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের কলোনিপ্রতিম পূর্ববাংলার মানুষের মনে বাঙালির অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ, ভাষা-আন্দোলন ও নানা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাগৃতি ও জাতীয় ঐক্যের বীজমন্ত্র রোপিত হচ্ছিল।

আর এই নবজাগৃতির বাহন হয়েছিল বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা এবং ভূগোলভিত্তিক এক নতুন ও শক্তিশালী বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশিষ্টরূপ— এমনকি ভবিষ্যৎ পথরেখা সম্পর্কে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের জনপ্রিয় বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে দেয়া তাঁর ভাষণে। তাতে তিনি বলেন, "Sir you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'... The word. 'Bengal' has a history, has a tradition of its own." তবে তিনি শুধু ঐতিহ্য-গর্বের প্রকাশ ঘটাননি, তার মধ্যে এনেছেন যুক্তি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা। তাই পরের লাইনেই বলেছেন, "You can change it only after the people have been consulted (Speaches of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament compiled by Ziaur Rahaman [Ziaur Rahaman Shahriar Iqbal] vol. l, p-12, 17 March 1990)

তিন

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশধারার সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য প্রণীত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক নীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের মনে যে নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় তারই ফলে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। এই আন্দোলনের কর্মী-সংগঠক-সমর্থক বিশেষ করে এর নেতৃ-পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক-মৌলবাদীচক্র এবং তাদের সহযোগী সামরিক ও ছদ্ম-সামরিক স্বৈরশাসকেরা গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করার লক্ষ্যে বারবার সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব-বাংলায় বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশকে ধ্বংস করার প্রয়াস পায়। এই লক্ষ্যে তারা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পূর্ব-বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ এই এক যুগ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যে-সব পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তার সফল পরিসমাপ্তির রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশলের এক চমৎকার রূপরেখা তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এ ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করার কৌশল এবং তাতে সাফল্য লাভের দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল বিজয় অর্জন করার পর পাকিস্তানি সামরিক-জান্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো নানা কূটকৌশল, শঠতা ও স্বৈরাচারী পন্থায় সংখ্যাগুরু বাঙালির এই নির্বাচনী বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতা লাভের অধিকারকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং এই অগণতান্ত্রিক ও ঘৃণ্য কাজের জন্য তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালিকে চিরতরে দাবিয়ে দেবার পাঁয়তারা শুরু করে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা, এর আদেশ-নির্দেশের পরিপূর্ণতা, এর বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং এর পেছনে বাংলার মানুষের সমর্থন একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সরকার ও দেশ পরিচালনার এক নিপুণ সনদে পরিণত করে। ফলে গোটা পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সরকার-কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও নেতৃত্বে কার্যত একটি বিকল্প নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই নতুন রাষ্ট্রের নৈতিক, আদর্শিক এবং গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার ৩৫টি নির্দেশমালা তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যরা তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর এই অসহযোগ আন্দোলন এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার নির্দেশমালার গুরুত্ব এখানে যে গোটা বাংলাদেশের মানুষ বিপুলভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে সমর্থন করেছিল, এর মাধ্যমে সরকারি প্রশাসন চলছিল এবং বাংলার জনগণ অঙ্গীকারদীপ্ত প্রত্যয়ে এর জন্যে জান বাজি রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, এর আগে ইংরেজ আমলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন জনসমর্থন পেলেও প্রকৃতিতে ছিল নিষ্ক্রিয় এবং তার সাফল্য ছিল পরোক্ষ ও আংশিক, এর তুলনায় বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ পাকিস্তানি শাসকচক্রের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্য ছিল এক চূড়ান্ত ও সফল পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের পেছনে জনগণের নির্বাচী ম্যান্ডেট ছিল। মহাত্মা গান্ধীর তা ছিল না। তাই তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল দুর্বল।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিচার করলে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই ঘোষণা দেবার বৈধ অধিকারী ছিলেন। কারণ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁর নির্বাচনী বৈধতা ও জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ম্যান্ডেট ছিল। দ্বিতীয়ত ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (বঙ্গবন্ধু যে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন) তাঁর কাছে

হস্তান্তরিত হয়েছিল। শুধু ক্যান্টনমেন্টসমূহেই পাকিস্তানের কিছুটা কর্তৃত্ব টিকে ছিল। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্বের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। পূর্ববাংলার সরকারি প্রশাসন, উচ্চ আদালত, ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, সেবাখাত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশ নিয়ে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।

অন্য কারও এই আইনগত ভিত্তি (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা) ও জনগণের ম্যান্ডেট ছিল না। তাই তাদের ঘোষণার কোনও বিশেষ তাৎপর্য নেই।

চার

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, সংগ্রাম করছে, রক্ত দিয়েছে, অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশাটি উন্মুখ হয়ে উঠেছে তাকে ভাষা দিয়েছেন— এবং এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা এবং এই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব বহুমাত্রিক। বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এ ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কেউ কেউ এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ স্পিস্ বা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেন। এই তুলনাকে যথাযথ মনে হয় না। ওই দুটি ভাষণের প্রেক্ষাপট আলাদা— বঙ্গবন্ধুর মতো বিপুল মানুষের আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ এবং প্রবল শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে তাঁদের ওই ভাষণ দিতে হয়নি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উইনস্টোন চার্চিলের একটি ভাষণের সঙ্গেই শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছুটা তুলনা চলতে পারে। তবে এখানেও চার্চিল শত্রুপক্ষকে আকাশে, মাটিতে এবং জলরাশিতে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন মিত্রশক্তির প্রবল শক্তিশালী অবস্থান থেকে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু "আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো" কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন সর্বাধুনিক অস্ত্র, যুদ্ধ-প্রযুক্তি ও উন্নত কৌশলসমৃদ্ধ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে। তাঁর অবস্থান ছিল নিরস্ত্র, কিন্তু বিপুল জনসমর্থনধন্য জননেতার অসম-অবস্থান। তবে জনশক্তি যেহেতু যে কোনও মারণাস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী— বঙ্গবন্ধু সেই শক্তির অবস্থান থেকেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। স্পষ্টতই, বঙ্গবন্ধু গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর মোকাবেলা করতে বলেছিলেন। তাই চার্চিলের এবং বঙ্গবন্ধুর শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্য এক হলেও পথ ছিল ভিন্ন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ওইসব ভাষণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সঙ্গে

একটা জাতি গঠন প্রক্রিয়ার পূর্ণতা এবং একটা জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও বিপুল আত্মত্যাগের ইতিহাস যুক্ত রয়েছে। দার্শনিক নিৎসে রাষ্ট্র গঠনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক কর্ম বলে আখ্যাত করেছেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র গঠনের এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই আমরা বলি তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির পিতা।

পাঁচ

এই ভাষণের মাধ্যমে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয়-ত্রাস এবং আশা ও সম্ভাবনায় উদ্বেল সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মাত্র ১৯ মিনিটের এক জাদুকরী ভাষণে রাজনৈতিক চেতনার একই স্তরে এনে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ অঙ্গীকারে দীপ্ত মুক্তি সেনানীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির মেলা ভার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন : "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" নেতাজী সফল হননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে, "মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ"— উক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে জানা যায়, কিশোর বয়সে তিনি সুভাষ বসুর বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে সুভাষ বসুর চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির কথা তাঁর অবশ্যই মনে পড়ে থাকবে। শুধু মনে পড়া নয়, কিশোর বয়সের মেন্টর (Mentor)-কে ছাড়িয়ে যাবার বাসনাও তাঁর মনে ছিল নিশ্চয়ই। বঙ্গবন্ধু বিপুল পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। বহু রাজনৈতিক মনীষীর জীবন ও কর্মের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাই তাঁর চার্চিল চর্চাও স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে ৭ মার্চের ভাষণ যখন তিনি মনে মনে তৈরি করেন তখন লিংকন, চার্চিল ও নেতাজীর প্রাসঙ্গিক ভাষণকে অবশ্যই তিনি স্মরণ করে থাকতে পারেন। তবে ৭ মার্চের অনন্যসাধারণ ভাষণ, তাঁর এবং শুধু তাঁরই এক চিরকালীন মাস্টারপিস।

ছয়

ইতোপূর্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটি থেকে দু'একটি অংশ প্রাসঙ্গিকতার কারণে উল্লেখ করেছি। এবার আমরা মূল ভাষণে প্রবেশ করব। কী নেই সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণে? বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস আছে, তা বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া আছে আবেগ, রক্ত-ঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আশা-প্রত্যাশার ন্যায্যতা, আছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। এইসব মিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি মানবিক বোধের শ্রেষ্ঠত্ব, গণতান্ত্রিক চেতনার উজ্জ্বলতা এবং

নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার অর্জন ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে। এসব গুণের জন্য শুধু বাঙালি নয়, গোটা বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশ পরিস্থিতির প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সহানুভূতিশীল করেছে।

ভাষণটির গঠনে কৌশলময়তা আছে, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান ও শব্দ চয়নের মুন্সিয়ানা আছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষ', 'আমার মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব বাংলার অধিকার-বঞ্চিত মানুষের জন্য আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম, জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে জনগণের একেবারে হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যাওয়া তাঁর মতো নেতার পক্ষেই এই ভাষায় শ্রোতাদের সম্বোধন করা সম্ভব।

মানুষকে জাগ্রত, উদীপ্ত এবং তীব্র অধিকার সচেতন ও লড়াকু মানসিকতাসম্পন্ন করার জন্য সুদক্ষ বাগ্মীরা কতগুলো কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তা করেছেন পরিচ্ছন্ন দক্ষতা ও সুগভীর আন্তরিকতায়। মার্কিন সাময়িকী 'নিউজউইকের' ভাষায় 'রাজনীতি'র এই 'কবি' আন্তরিক আবেগ—প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বাংলার মানুষের ওপর নানা অত্যাচার-নির্যাতন–শোষণের নির্মমতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হাতিয়ারপ্রতিম 'কী ওয়ার্ড' গুলো বারবার ব্যবহার করে নতুন ব্যঞ্জনা এবং মানুষের রক্তে বিদ্রোহের গতিবেগ সৃষ্টি করেছেন। এসব মূল কথাগুলোকে বারবার সামনে আনায় শ্রোতাদের মনে তা স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে 'মুক্তি' ও 'মুক্ত' শব্দ দুটি বেশি গুরুত্বে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষ দুস্থ ও দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই তিনি তাঁর ভাষণের চতুর্থ লাইনেই বলেছেন : "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়;" এবং অষ্টম লাইনেই আবার 'মুক্তি' শব্দটি এসেছে এভাবে : "এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।" আবার বলেছেন : "যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে," এবং "এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।" তবে এই ঐতিহাসিক ভাষণের সারকথা যে বাক্যটিতে উচ্চারিত হয়েছে 'মুক্তির' কথা তাতে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে যেমন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বাংলার মানুষকে একাত্ম করার জন্য এবং নিজ ক্যারিশমানুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অভিভাবক হিসাবে নিজ কাঁধে নেবার জন্য বঙ্গবন্ধু 'আমার' শব্দটিকে বারবার ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ : "ভাইয়েরা আমার," "আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে," "আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে," "আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে,—তাঁর বুকের ওপর হচ্ছে গুলি," "আমার গরিবের উপর," "আমার বাংলার মানুষের," "আমার মায়ের

কোল খালি করা হয়েছে," "আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে," "আমার মানুষ কষ্ট না করে," "আমার লোককে হত্যা করা হয়" ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, "ভাইয়েরা আমার" বলে এবং শুরুতে বলেছিলেন, "আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।" এবং ভাষণের শেষাংশে আসতে আসতে তাঁর কম্যুনিকেট করার আত্মীয়সুলভ ভঙ্গিতে তিনি এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যে তাদের সহজেই 'তুমি' সম্বোধন করতে পারছেন। এতে শ্রোতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে এবং তাঁর বক্তব্যের আবেদন বেড়েছে। এতে বক্তা এবং শ্রোতা একাত্ম হয়েছেন। ভাষণের কেন্দ্রবিন্দুটি ঠিক রেখে তিনি নানা অপরিহার্য উপাদানকে গ্রথিত করেছেন। তবে ভাষণের ধারাবাহিকতাকে কখনও ক্ষুণ্ন হতে দেননি। এবং কোনও পয়েন্টই মূল বক্তব্যকে শিথিল করেনি। বরং ওইসব আনুষঙ্গিক উপাদান মূল বক্তব্যকে সংহত ও জোরালো করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষা-ভঙ্গি ও বাক্ প্রতিষ্ঠায় তাঁর চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক দার্ঢ্য বিদ্রোহের মানসিকতা এবং কোনও অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাপ, কাব্য-স্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবে আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্ট রূপের স্পর্শ পেয়ে ৭ মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর আপোষহীনতা ও চারিত্রিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছেন লৌকিক ভাব-ভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজনে। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তাসদৃশ কিছু শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড় সম্পৃক্ত বুলি সমৃদ্ধ এরকম একটি লাইন হলো : "সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।"

বঙ্গবন্ধু এই ভাষণকে কখনও কখনও শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ন করে করে সত্য যাচাইয়ের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, কি অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? এইসব প্রশ্ন যেন বঞ্চনার অমোঘ উদাহরণকে তুলে ধরেছে। এই ভাষণে যুক্তি ও মানবিক আবেগের নিপুণ সমন্বয় আছে। তেমনি রাজনীতির কবির ওজঃগুণসম্পন্ন, স্পন্দনযুক্ত চমৎকার রেটরিকস (Rhetorics) আছে। যুক্তির ক্ষেত্রে সর্বত্র গুরুত্ব দেয়া একটি বাক্য : "যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" ইতিহাস আবেগ ও রেটরিক্যাল ভঙ্গির আর একটি উদাহরণ : "আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।"

জনগণের প্রবল চাপ ও প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। বঙ্গবন্ধু যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন তখন জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রলীগের উপর দেয়া হতো অগ্রগামী দল হিসেবে, যেমন 'জয় বাংলা' 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়– মুক্তিবাহিনী গঠন কর' শ্লোগান, 'স্বাধীনতার পতাকা' জাতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি সুপরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগকে দিয়ে প্রথমে মাঠে ছাড়েন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের তৎকালীন ক'জন বিশিষ্ট নেতাকে নিয়ে ১৯৬১ সালেই একটি গোপন নিউক্লিয়াস গঠন করেন। এদের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের এইসব উপাদান জনসমক্ষে আনা হয়। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ এই নিউক্লিয়াসের তৈরি এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের নামে প্রচারিত ইস্তেহারে বাংলাদেশের নাম, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, মুক্তিবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, সামরিক প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করা হয়। অতএব যারা বলেন বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তারা হয় তা অজ্ঞতাপ্রসূতভাবে বলেন অথবা মিথ্যাচার করেন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, ৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্রদের ঐ বিস্তৃত ইস্তেহারই বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল। এ সময়ে তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী শুভানুধ্যায়ী নয়, বাম রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথেও একটা যোগাযোগ রাখতেন। এভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বস্তরে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। ১৯৬৫ সালে বায়াফ্রার Unilateral Declaration of Independence (UDI) কথা তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাষণে বললেন : "এ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁর তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।"

বঙ্গবন্ধুর এই চারটি শর্তকে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ রণকৌশল হিসেবে আখ্যাত করা যায়। আমাদের বিবেচনায় মাস্টার-স্ট্রোকসমৃদ্ধ এই চারটি শর্তে তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে : **এক.** স্বাধীনতা ঘোষণা শোনার জন্য পাগলপারা উত্তাল জনসমুদ্র একটু থমকে গেছে, তবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেনি, তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে যে বঙ্গবন্ধু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই একটি কৌশলগত ধাপ হিসেবে এই কঠিন চারটি শর্তকে সামনে নিয়ে এসেছেন; **দুই.** দৃশ্যত নেতা গণতন্ত্রসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই আছেন এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

হিসেবে তাঁর এই শর্তসমূহ যৌক্তিক— বহির্বিশ্বকে এমন ধারণা দেয়া। এই শর্ত দেয়া না হলে, তাঁর "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"– এই বাক্যকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (UDI) বলে গণ্য করা হত। তাতে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। ফলে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্বজনমত দুই-ই তাঁর বিপক্ষে চলে যেত। তাই রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও মেধাবী কৌশলবিদ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও তার কার্যকারিতাকে তিনি শর্তসাপেক্ষ করে রাখলেন। **তিন.** আমাদের ধারণা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি শাসকচক্র ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। এতে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাই নিহত হতেন। স্বাধীনতার ঘোষণার শর্তযুক্ত বাতাবরণ পাক-শাসকদের সেই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুরধার রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা ক্রোধান্ধ বুনো শুয়োরের মতো নিজেরাই একতরফা ক্রাকডাউনে গিয়ে গণহত্যা শুরু করায় বঙ্গবন্ধুর চার শর্ত বাতিল হয়ে গিয়ে ২৬ মার্চ থেকে তার ঘোষণা কার্যকর হয়। ২৬ মার্চ মধ্য রাতে তাঁর স্বাধীনতার নতুন ঘোষণাটি ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

আসলে চারটি শর্ত দিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ৭ মার্চেই আক্রমণকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা ওইদিন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা করে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তা না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করার জন্য ইয়াহিয়া, ভুট্টো আলোচনার ছলনাময় অধ্যায়টির সূত্রপাত করে। ফলে পরিস্থিতি কী হবে তা কি বঙ্গবন্ধু জানতেন না? অবশ্যই জানতেন এবং তাঁরও কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি আলোচনা চালালেন কিন্তু জানতেন এ হবে নিষ্ফলা। সেজন্যই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হয়েও ৭ মার্চের ভাষণে আসন্ন পরিস্থিতিতে বাঙালির করণীয় নির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এই ভাষায় :" "তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই— আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।" পাকিস্তানি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই বক্তব্য গেরিলা-যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। দিব্য চোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েই যেন আবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বললেন, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।" এবং স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে আবার সামনে আনলেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়

কে এম সোবহান

উনিশ শ' একাত্তরের ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দান (যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বলে পরিচিত) থেকে ঠিক বিকেল ৩টা ২ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই আপ্তবাক্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৮ মিনিটের সেই বক্তৃতা পাল্টে দিল বাংলার ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস। এ আপ্তবাক্য কি হঠাৎই উচ্চারিত হয়েছিল? এর পেছনে প্রস্তুতি ছিল, সংগ্রাম ছিল, রক্ত ঝরেছিল বহুবার, সেই বায়ান্ন থেকেই। যেদিন বাঙালি বুঝতে শিখেছিল যে, সে বাঙালি, বাংলা তার ভাষা সেদিন থেকেই পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু। ১৯৪৮-এ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, 'If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis and Sindhis first, and Moslems and Pakistanis only incidentally, then Pakistan is bound to disintegate.' *(The Magazine, ১৫ মার্চ ১৯৭১)*। ৭ মার্চের আগেই বঙ্গবন্ধু Time-এর সংবাদদাতা Dan Coggin-কে বলেছিলেন, সমঝোতার আর কোনো আশা নেই।

১ মার্চ থেকেই রাজপথে রক্তপাত আরম্ভ করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। জেনারেল ইয়াহিয়া আবার ঘোষণা দিল যে, গণপরিষদে বৈঠক বসবে ২৫ মার্চ। জেনারেলের দম্ভভরা কণ্ঠে শোনা গেল, 'যতদিন আমি সেনাবাহিনীর প্রধান আছি, আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হয়।' বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের বক্তৃতায় ভেসে গিয়েছিল জেনারেলের দম্ভোক্তি। নিষ্ঠুরভাবে সত্য হয়েছিল জিন্নাহর আশঙ্কা। জেনারেলের দম্ভোক্তির উত্তরে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ওদের আমি শায়েস্তা করে দেবো, ওদের হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করবো।'

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-তে শেখ মুজিব ৬ দফা প্রস্তাব লাহোরে উত্থাপন করেন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে এ কর্মসূচি বিচলিত করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ তা। ৬ দফা প্রস্তাবে ছিল

বাঙালির বাঁচার দাবি এবং ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন মোড় নেয়। তখন থেকেই শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি এগুতে থাকে।

৭ মার্চের ভাষণের পর ধাপে ধাপে অথচ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় রাজনীতি। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার জন্য যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিল এবং তার নির্দেশনা বাস্তবে রূপান্তরিত করার কঠোর শপথ নিল। বস্তুত স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় ৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পতনের সাথে। বিকল্প সরকার চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর আদেশে। সচিবালয়ই হোক বা মন্ত্রণালয়ই হোক, তা স্থানান্তরিত হলো ইডেন বিল্ডিং থেকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে। ছয় দফা তখন এক দফার সংগ্রামে রূপ দেয়— স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু— আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এ আদেশ সশস্ত্র সংগ্রামের আদেশ, যুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ আলোচনা অসমাপ্ত রেখে জেনারেল ইয়াহিয়া করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা গেল দেশের সর্বত্র এবং সকলকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন বঙ্গবন্ধু। 'When the First shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like a prerecorded message the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh (David Loshake, Pakistan Crisis, London, PP. 88-89), বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় তাঁর স্বকণ্ঠে বলা হয়েছিল, 'Peoples are fighting gallantly with the enemy for the cause of freedom of Bangladesh. Every section of the people of Bangladesh are asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help you in your struggle for freedom from the enemy. Jay Bangla.' (The Statesman, Delhi, 27 March, 1971).

বঙ্গবন্ধুর এ আদেশেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়েছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতার জন্য। ২ লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে।

মার্চের প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হারিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাংলাদেশের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা। মওলানা

ভাসানীর মতো নেতাও মেনে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। ৯ মার্চ তিনি পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় বললেন, অবিলম্বে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মেনে নেয়ার জন্য। মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু না হলে আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের মতো তুমুল আন্দোলন শুরু করব। খামাখা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করে চিনি...।' (ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃ. ২৮৮-৮৯)। ১২ মার্চ ১৯৭১ ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস ময়দানে মওলানা ভাসানী বললেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ (পূর্বদেশ, ১০.৩.৭১)। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো হানাদার বাহিনী। তাঁর গ্রেপ্তারের বর্ণনা বঙ্গবন্ধু নিজে দেন ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ সাংবাদিক David Frost-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, যা WNEW-TV নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত হয় David Frost show-তে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী সে রাতে আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারা আমাকে মেরে ফেলত যদি আমি বাড়ির বাইরে আসতাম। তবে মেরে ফেলার পর বলত চরমপন্থীরা আমাকে খুন করেছে। আমাকে মেরে ফেলার অজুহাতে ইয়াহিয়া খান আমার দেশের মানুষকে খুন করত। তারা হত্যাযজ্ঞ চালাত।' 'আমি কলকাতা কেন, যে কোনো দেশে পালাতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার দেশের লোককে যুদ্ধ করার কথা বলেছিলাম, তাদের ফেলে আমি কোথায় যাব?' ফ্রস্ট এর উত্তরে বলেন, 'সে কথা ঠিক, এই ৯ মাস আপনাকে আপনার দেশের মানুষ আস্থার প্রতীক হিসেবে দেখেছে। তারা আপনাকে এখন ঈশ্বরের মতো মনে করে।' ফ্রস্ট জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে তারা কীভাবে গ্রেপ্তার করল?' উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার এই বাড়িতে তারা মেশিনগান দিয়ে গুলি করে। আমার শোয়ার ঘরেও গুলি করে। তারা চারদিক থেকে গুলি করতে থাকে। আমি আমার স্ত্রীকে দুই ছেলেকে নিয়ে শোয়ার ঘরে থাকতে বলে বের হয়ে আসি এবং তাদের বলি তোমরা গুলি বন্ধ করো। আমি তো এখানেই আছি। তারা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে। একজন অফিসার আমাকে ধরে বলে ওকে মেরে ফেলো না।' তারপর তারা আমাকে আমার সমস্ত শরীরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করো। আমাকে আমার পাইপ এবং তামাক আনতে দাও বা স্ত্রীর কাছ থেকে এগুলো নিয়ে এসো। তারা আমার বাড়ির সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার জিনিসপত্র সব লুট করে নিয়ে গেছে, তাতে আমার কোনো দুঃখ হয়নি, কিন্তু আমার ৩৫ বছর রাজনৈতিক জীবনের যে ইতিহাস ডাইরিতে লিখেছিলাম, তা নিয়ে গেছে। তারা আমার বইপত্র এবং কিছু প্রয়োজনীয় দলিল নিয়ে গেছে।' (বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, ২য় ভল্যুউম, পৃ. ৬১৪)

বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার খবর সরকারিভাবে তখন দেয়া হয়নি। জে. ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টিভিতে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে বলে, ২৩ মার্চ রাজনৈতিক নেতারা মুজিবের সাথে কথা বলতে যায় অ্যাসেম্বলি বসার বিষয়ে। তারা আমাকে বলে, মুজিব যে কর্মসূচি দিয়েছে তা থেকে নড়তে রাজি নয়। মুজিব চায় যে, আমি সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণা দিই এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করি। শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন একটি রাষ্ট্রোদ্রোহী কাজ। সে এবং তার দল তিন সপ্তাহাধিক কাল আইনের কর্তৃত্ব অবজ্ঞা করেছে। তারা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছে। জাতির পিতার প্রতিকৃতিকে অপবিত্র করেছে। তারা একটি সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা করেছে। তারা গোলযোগ, সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে... এমনকি তারা আমার ঢাকায় উপস্থিতিতেই সে এবং তার অনুসারীরা সরকারের কর্তৃত্ব অমান্য করেছে। সে জানত যে সামরিক আইনের অবর্তমানে সে নির্বিঘ্নে যা খুশি তাই করতে পারত। তার অবাধ্যতা, গোঁয়ার্তুমি এবং কোনো রকম যুক্তিযুক্ত কথা বলতে অস্বীকৃতি থেকে কেবল একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, সে এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সে এই দেশের সংহতি এবং অখণ্ডতার উপর আঘাত করেছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ অপরাধের শাস্তি না দিয়ে পারা যায় না।' (দ্য ডন, ২৭. ৩. ৭১)

বঙ্গবন্ধুকে হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় জে. ইয়াহিয়ার নির্দেশে, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের জন্য। এদিকে বঙ্গবন্ধুর শেষ আদেশে দেশের লোক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেয়া স্লোগান, 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে শারীরিকভাবে অনুপস্থিত কিন্তু তার প্রতীকের উপস্থিতি সর্বত্রই। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগর তাঁরই নামে। ১০.৪.৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ঢাকাতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

এ ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, সংবিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন, রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের অবর্তমানে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। এ ঘোষণাপত্রটি ১৭ এপ্রিল সর্বসমক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করেন। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

একটি ভাষণ দেন। তিনি ভাষণের প্রারম্ভেই বলেন, 'আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে... ।'

১৩ এপ্রিল দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক খবরে প্রকাশ–'মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের পটভূমিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে একটি যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।'

বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ করা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মস্থল। ১৭ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে দিল্লির দ্য স্টেটসম্যান ১৮.৪.৭১-এ লিখল : ঘোষণাপত্র প্রকাশের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের সরকার জানাল যে, কেবল ঐ সরকারপ্রধানই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নন, তাঁর নামে সরকারের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হবে এবং সরকারের কর্মস্থলের নাম হলো 'মুজিবনগর'।

৩.৫.৭১ ইস্ট পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বিশ্বের বন্ধুপ্রতিম কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক দলের কাছে এক চিঠিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা জানান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সমর্থনের জন্য আবেদন জানান এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানানোর আবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক মানসিকতা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল এ ধরনের আবেদন জানানো।

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে নেয়ার পর তাঁর খবর দীর্ঘদিন দেশবাসী জানতে না পারলেও তাঁর নামেই সরকার এবং গেরিলাযুদ্ধ পরিচালিত হয়; তাঁর স্লোগান, বিশেষ করে তাঁর দেয়া 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করত নতুন উদ্দীপনায় যুদ্ধ করতে। একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে যুবকর্মীদের একত্রিত করা হয়। জুন মাস থেকে তাদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয় গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য। নভেম্বর পর্যন্ত এ ট্রেনিং চলে। প্রথমে এ ট্রেনিংপ্রাপ্তদের নাম দেয়া হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স'। পরে এদের 'মুজিব বাহিনী' নাম দেয়া হয়।

২৬ এপ্রিল '৭১-এ আমেরিকার 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিন লিখল যে, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বঙ্গবন্ধুকে জেলে রেখে তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করার উদ্যোগে খুব আস্থা লাভ করছে। নিউজ উইক আরো লেখে যে, ৫১ বছরের প্রগতিশীল নেতা, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের মূর্ত প্রতীক, তাঁকে জেলে রাখায় বাংলাদেশ সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৭ জুলাই ১৯৭১ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ 'পাকিস্তানের একমাত্র উপায়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মিসেস গান্ধীর ওপর চাপ ক্রমশই বাড়ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে। বিলেতের প্রেস ক্রমশই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে। ইয়াহিয়ার ভুলত্রুটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধত্ব পাকিস্তানকে যে গভীর খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে বন্দিশালা থেকে মুক্তি দেয়া এবং তাঁকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে দিলে তিনিই কেবল শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। ঐ নেতার প্রজ্ঞা তাঁর রাজনৈতিক-বিরোধীদের পথ দেখাতে পারে।'

বিদেশী পত্রিকাগুলো একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উন্মাদনা থেকে তিনিই যে কেবল তাদের উদ্ধার করতে পারেন, এ কথা পত্রিকাগুলো একবাক্যে মেনে নিয়েছিল। তাদের ভুল যেখানে ছিল, তা হচ্ছে, তারা বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি যে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটির কবর খুঁড়েছিল ইয়াহিয়া খান এবং তার পাকিস্তানি রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা। ২৬ মার্চের পর পাকিস্তান যে পর্যায়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ ছিল না। বাংলাদেশে স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেখান থেকে পিছু ফেরার আর কোনো পথ ছিল না।

কায়হান ইন্টারন্যাশনাল ২৭ জুলাই ১৯৭১ ইয়াহিয়া খানের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানায়, 'মুজিবকে শীঘ্রই রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য বিচার করা হবে, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরির কাজ শেষ হলেই। পত্রিকার পক্ষ থেকে এক প্রশ্নের উত্তরে ইয়াহিয়া খান জানায় যে, সামরিক বিচারকদের হাতে বিষয়টি রয়েছে। কাজেই সে বলতে পারবে না যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের আগে মুজিবের বিচার বা তাঁর ফাঁসি হয়ে যাবে কিনা। কোর্ট মার্শালে তাঁর বিচার হবে এবং পরিষদের অধিবেশনের আগে সে বেঁচে থাকবে কিনা, তা ইয়াহিয়া খান জানে না।

এ সাক্ষাৎকার থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালে বিচারের প্রহসন চলছিল এবং বিচারে যে তাঁর ফাঁসির হুকুম হবে, তাও নিশ্চিত ছিল।

২ আগস্ট ১৯৭১-এর নিউজ উইকে লেখা হয় যে, মুজিবকে সামরিক ছাউনি মিয়াওয়ালির একটি জেলে রাখা হয়েছে। মুজিব একজন জাতীয় নেতা থেকে শহীদে রূপান্তরিত হয়েছেন। জে. ইয়াহিয়া গর্বের সাথে জানায় যে, তার জেনারেলরা মুজিবের সামরিক আদালতে বিচার এবং ফাঁসির জন্য কাজ করে চলেছে। সে রাজি হয়েছে এবং বিচারের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পত্রিকাটিতে মন্তব্য

করা হয়েছে যে, এ পদক্ষেপের চেয়ে স্বল্প দৃষ্টির আর কোনো কাজ হতে পারে না এবং এতে মুক্তিযুদ্ধকে আরো কঠিন পথে নিয়ে যাবে। পত্রিকাকে একজন পশ্চিম দেশের কূটনীতিক জানান যে, ইয়াহিয়ার মতিভ্রম হয়েছে এবং সে কী করছে, তা জানে না, এমনকি বুঝতেও পারছে না তার সেনাবাহিনী কী করছে। সে মনে করে যে, সে কয়েক লক্ষকে মেরে ফেলতে পারে, মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বিচার করতে পারে এবং এই করে সে সবকিছুর সমাধান করতে পারবে। এটা একটা নিছক পাগলামি। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিলে যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বা পাকিস্তানের কী হবে, তা কূটনীতিকের এ কয়টি কথার মধ্যেই বোঝা যায়। বঙ্গবন্ধুর যে ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যে বঙ্গবন্ধুকে জে. ইয়াহিয়া সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করছে, তাঁর প্রভাব মুক্তিযুদ্ধের ওপর এত বিশাল যে, তাঁকে হত্যা করলেও তাঁর দেয়া নেতৃত্ব বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে, যা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ বলেছিলেন। করাচির এক সম্পাদক নিউজ উইককে বলেন যে, শেখ মুজিবের ডাকে পাকিস্তান মার্চ মাসেই মারা গেছে। কোনো কিছুই এখন আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না। পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেও লেখা হয় যে, ইয়াহিয়া বিস্মৃত হচ্ছে সে কী কাজ করছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মুজিবকে মরতেই হবে। কিন্তু যেদিন মুজিবকে ফাঁসি দেবে সেইদিন পাকিস্তানেরও ফাঁসি হবে।

১১ আগস্ট ১৯৭১ ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন জানায় যে, অতি শীঘ্রই শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ হবে। তার বিচার এবং ফাঁসি দেয়ার কথা আগেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের বিচার কঠিন মুক্তিযুদ্ধকে কঠিনতর করে তুলবে। সশস্ত্র সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এত পরিষ্কার।

১২ আগস্ট ১৯৭১-এ দ্য টাইমস-এর 'শেখ মুজিবের ভাগ্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে বিচারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক। 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া' চার্জটি দৃশ্যত অস্বাভাবিক। এ সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য কথা বলতে পারেন, যাতে পাকিস্তানের আরও বড় ট্রাজেডি না হয়। শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি, যার উপর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা আছে। কিন্তু যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাহলে আলাপ-আলোচনার আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাঁর আদেশ মেনে চলবে। সমস্ত সম্পাদকীয়টি পাকিস্তানের ভ্রান্ত রাজনীতির ওপর জোর দিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করেছে। সম্পাদকীয়টির পরিশেষে বলা হয়েছে, 'আমাদের সকলকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে শেখ মুজিবকে বাঁচানোর জন্য।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোষ্ঠীর অভিমত ছিল যে, পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হবে এবং সে কাজটি পারেন কেবল বঙ্গবন্ধু। পরোক্ষভাবে এরা বুঝতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু যদি ইচ্ছা করেন

তাহলে মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ হতে পারে এবং তাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। অপরদিকে, যদি বঙ্গবন্ধু আটকও থাকেন তবুও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলোকবর্তিকা এবং তিনি যে আদেশ দেবেন মুক্তিযোদ্ধারা তাই মেনে নেবে। যে জিনিসটি এই গোষ্ঠী কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিল না, তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন। সেখান থেকে আর তাঁর পেছানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা থেকে ১৯৭১-এর ১ দফা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৭১-এর ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন জানাল যে, মার্কিন সিনেটর কেনেডি, যিনি সিনেটে শরণার্থী সাব-কমিটির চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তানে ৪ দিনের সফর শেষে নতুন দিল্লি পৌঁছেছেন। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য যে জনসমাগম হয়েছিল, তাদের হাতে ছিল প্লাকার্ড, যাতে লেখা ছিল, 'শান্তির মানুষ কেনেডি স্বাগতম'। অন্যান্য প্লাকার্ডে লেখা ছিল 'মুজিবকে বাঁচাও', 'শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা।' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি দৃঢ় হতে থাকে এবং তা আসতে থাকে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই।

১৭ আগস্ট ১৯৭১-এর হেরাল্ড ট্রিবিউনে লিখল, সিনেটর কেনেডি বলেছেন যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইনের ধারণার পরিপন্থী। সংবাদপত্র জানাল যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার আগের সপ্তাহে পাকিস্তানের কোনো জায়গায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর বিচার বা তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। পত্রিকা জানায় যে, সিনেটর কেনেডির মতে মুজিবের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে যে, তিনি নির্বাচনে জিতেছেন। ঐ পত্রিকা আরো লেখে যে, রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি জোর দিয়ে বলেছেন যে, শেখ মুজিবকে যে আইনের অধীনে বিচার করা হচ্ছে, তা ব্রিটেন এবং ভারতের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাঁকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হবে না। পত্রিকা লেখে যে, যদি শেখ মুজিবের ফাঁসি দেয়া হয় বা আরো শরণার্থী ভারতে আসে, তাহলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

সেপ্টেম্বরে মিসেস গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নে যান ওখানে জনমত গঠনের জন্য এবং সোভিয়েত সরকারকে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য। মিসেস গান্ধী জানান, ভারতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আগমনের কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতের অবস্থা নাজুক হয়ে গেছে। সোভিয়েত নেতারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ

করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দিচ্ছিল, কেননা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জড়িয়ে পড়লে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পক্ষ নিতে বাধ্য করবে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ তেহরান থেকে প্রকাশিত দৈনিক আয়েনলেগান লিখল যে, মুজিবুর রহমানের বিচার পাকিস্তানের পক্ষে আত্মহত্যার শামিল হবে এবং তাতে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সমাধান অসম্ভব হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ-পাকিস্তান রাজনীতির একজন প্রধান নায়ক তা এই উদ্বেগ থেকেই বোঝা যায়। এই গোষ্ঠী জানত যে, যদি মুক্তিযুদ্ধ চলে তাতে পাকিস্তানের জয়লাভের আশা খুবই কম, কাজেই তাদের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে সমস্যা সমাধান না করে রাজনৈতিক সমাধানের পথ গ্রহণ করেন তাহলে পাকিস্তান রক্ষা পায়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র পথ তাই বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধ করে তাঁকে মুক্ত করে আলোচনার টেবিলে আনা। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আলোচনার সব পথ বন্ধ হওয়াতেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সংগ্রাম করে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য শেষ বাঙালি বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। সে আদেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে দেখা গেল যে, মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধে যতই সাফল্য লাভ করছে, পাকিস্তান ততই মরিয়া হয়ে উঠছে। দুটি বিষয়ের প্রথমটি হলো যে, মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের কারণ ভারতের গোপন সহায়তা এবং দ্বিতীয়টি হলো বন্ধবন্ধুর বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে তাঁর ফাঁসি দেয়া। যদি বঙ্গবন্ধুর বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়, তাহলে মুক্তিবাহিনী হতোদ্যম হবে এবং গেরিলাযুদ্ধে ভাটা পড়ে যাবে এবং ভারত এককভাবে তখন আর পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণায় উৎসাহ পাবে না। পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক সমাধানের কথা বললেও পাকিস্তান ততদিনে বুঝতে পেরেছিল যে, বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার টেবিল থেকে অনেক দূরে রণাঙ্গনে সমাধান হতে চলেছে। রণাঙ্গনে সমাধান বন্ধ করার পথ হিসেবে তারা বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং ফাঁসির হুকুমই একমাত্র উপায় বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নেতৃত্ব সম্যকভাবে জানত মুক্তিবাহিনীর পেছনের শক্তি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকবে। অক্টোবরের শেষে মিসেস গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ৯০ লক্ষ শরণার্থীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বাতাবরণ সৃষ্টির অনুরোধ করেন। মিসেস গান্ধী প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী প্রতাবর্তনের কথা বললেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলছিলেন।

১ নভেম্বর ১৯৭১-এ ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক আর্নো দ্য বুরশগ্রাদের সাথে সাক্ষাৎকারে তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে জে. ইয়াহিয়া বলেন যে, তিনি যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পাঠান, তাহলে সেখানকার

লোকই তাঁকে মেরে ফেলবে। জে. ইয়াহিয়া ভালো করেই জানত যে, যদি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ আরো তীব্র হবে এবং পাকিস্তানের পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। সে যদি তার নিজের কথায় বিশ্বাস করত তাহলে বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং তারপর ফাঁসির ঝুঁকি তাকে নিতে হতো না। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়ক বুঝতে পেরেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সমার্থবোধক হয়ে গেছে।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর লন্ডন টাইমস জানায় যে, মিসেস গান্ধী ভারতীয় লোকসভায় এক ভাষণে জানান যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের জনগণের সমর্থিত সরকার। ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা এখন চিন্তা করছি, এই নতুন রাষ্ট্রের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের কথা।' মিসেস গান্ধীর এই উদ্বেগ সহজেই অনুমেয়।

যদি পেছনের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে কেবল রাষ্ট্রগুলোই সোচ্চার হচ্ছিল, তাই নয়, ১০ আগস্ট ১৯৭১-এ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জ্যুরিস্টসহ ২১৪টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক টেলিগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামরিক বিচারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আদালতের কাছে কোনো কিছুই গোপনীয় নয়। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জ্যুরিস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কোর্ট মার্শালে ৫ জন সামরিক কর্মকর্তা ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা ইত্যাদি। সর্বমোট ১২টি অভিযোগ ছিল, তার মধ্যে ৬টির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন যে, সরকার তাঁকে সমর্থনের জন্য এডভোকেট দিতে চায়, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানান, কেননা তিনি বুঝতে পারেন বিচারটি একটি প্রহসনমূলক নাটক। তিনি বিচারককে অনুরোধ করেন, এডভোকেটদের চলে যেতে, কেননা জে. ইয়াহিয়া রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিনিই তাঁর শাস্তি পাকা করবেন এবং তিনিই আদালত বসিয়েছেন। ৪ ডিসেম্বর বিচারপর্ব শেষ হয়। জে. ইয়াহিয়া বিচারকের অর্থাৎ লে. কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ারদের ডেকে পাঠান রাওয়ালপিন্ডিতে এবং রায় দেয়ার আদেশ দেন। তারা তাঁকে ফাঁসি দেয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তারা তাঁর কারাকক্ষের কাছেই কবর খোঁড়ে, তিনি নিজের চোখে তা দেখেন। বঙ্গবন্ধু ফ্রস্টকে বলেন যে, ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে জানায়, ভুট্টোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে না মেরে ফেলা। সে ভুট্টোকে আরো বলে যে, ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে তাকে অনুমতি দেয়া হোক শেখ মুজিবুর রহমানকে মেরে ফেলার এবং তাকে বলতে দেয়া হোক যে, অনেক আগের তারিখেই তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৬১৭-৬১৯)।

জে. ইয়াহিয়া ১৯৭১-এর ৩ আগস্ট সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী এবং এর জন্য তাঁর বিচার হবে। সে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা তোমাদের অপরাধীদের সাথে কী রকম ব্যবহার করবে?' (দ্য ডন, করাচি, ৫.৮.৭১)। আগস্টের ৯ তারিখে একটি সরকারি প্রেসনোটে জানানো হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার হবে। ১১ আগস্ট বিচার আরম্ভ হবে। তাঁকে ২৬.৩.৭১ তারিখে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় (দ্য ডন, করাচি, ১০.৮৭১)।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অপরাধের বিচার যে প্রক্রিয়ায় হবে, তা পাকিস্তান সরকার গ্রাহ্য করে না (দ্য ডন, করাচি, ১৬.৮ ৭১)। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা শাহি জানায় যে, ২ সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। বিচার কোথায় হচ্ছে তা জানাতে রাষ্ট্রদূত অস্বীকৃতি জানায় (দ্য ডন, করাচি, ১.৯.৭১)।

প্যারিসের দৈনিক ল ফিগারোর সাথে ১.৯.৭১ তারিখে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জনগণের শত্রু।

দ্য ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, ১১.৮.৭১ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার আরম্ভ হয়েছে। ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্য ডনের ২০.১০.৭১-এ প্রকাশ করা হয় যে, প্যারিসের ল মডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, সে একজন বিদ্রোহীর সাথে কথা বলতে পারে না।

দ্য ইভিনিং স্টার, করাচি, ১৫.৯.৭১-এ লেখে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত ও আইনানুগ হবে।

২৬.৯.৭১ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানায় (রয়টার্স, ২৭.৯.৭১)।

রয়টার্স ৫.১১.৭১-এ জানায় যে, পাকিস্তানের ৪২ জন রাজনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, সাংবাদিক, আইনবিদ, লেখক, ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে।

ইউপিআই ইসলামাবাদ থেকে ১৮.১২.৭১-এ জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও রায় দেয়া হয়নি।

৮.৮.৭১-এ মিসেস গান্ধী শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের, যার অর্থ হচ্ছে ফাঁসি, দেয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রতিবাদ জানান।

জিডিআর ১৪.৮.৭১ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানায়। ২০.৮.৭১ ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল একই প্রতিবাদ ও অনুরোধ জানায়।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের এক সভায় আর্থার বটম বেল (ব্রিটেনের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সরকারদের অনুরোধ জানান, পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে, যাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ হয়।

মার্কিন সিনেটর এইচ পার্সি বলেন যে, যদি শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তান সরকারকে ঘৃণা জানাবে।

আরব লীগের প্রাক্তন প্রতিনিধি এবং আল আইয়ামের সম্পাদক কডিস মাকসুদ ২০.৯.৭১ তারিখে বলেন যে, আন্তর্জাতিক সমাজ এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর পক্ষ থেকে অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাক।

বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত বিচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে; এর একমাত্র কারণ ছিল যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূর্ত প্রতীক। তিনি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর নামেই, তাঁর ডাকেই মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং তারই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর (যাঁকে মিসেস গান্ধী নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জনক বলে অভিহিত করেন) বিচার বন্ধ করতে চাপ সৃষ্টি করে, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আরো গভীরভাবে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পর বিশ্বের সব মহলে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা থেকেও বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অধ্যায়ের তাঁর অবস্থান কোথায় ছিল, কী ছিল।

পেনাং-এর পত্রিকা দ্য স্টেটস ইকো ২২.১২.৭১-এ লেখে 'মুজিব বাংলাদেশের জনক এবং এটা অপরিকল্পনীয় যে, তিনি তাঁর জনগণকে অন্য কোনো পতাকার নিচে নিয়ে যাবেন।' একই পত্রিকা ৪.১.৭২-এ লেখে, 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা।'

খার্তুমের পত্রিকা আল আইয়াম ১০.১.৭২-এর সম্পাদকীয়তে লেখে, 'শেখ মুজিবুর রহমান কেবল মুক্ত ব্যক্তিই নন, তিনি সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের প্রধান।' শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে, তিনি একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ক্ষমতা এবং অধিকার আছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার।

দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান (পার্থ) ১২.১.৭২-এ এক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেছে, শেখের পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্য কোনো জাতীয় নেতা এই রকম নাটকীয়ভাবে এক দুরূহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে ক্ষমতায় আসতে পারতো না।'

শেখ মুজিব : বাঙালির উপনিবেশমুক্তির রূপকার

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুকে আমি প্রথম দেখি ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে— অথবা ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে, এতদিন পর সময়টা সঠিক মনে নেই, তবে কাগজপত্র ঘাঁটলে উদ্ধার করে নেয়া কঠিন নয়— আমি তখন ক্লাস টেন-এর ছাত্র। বয়সটা ছিল কঠিন– এ বয়সে মনের রাজ্য দখল করে নায়কেরা, আবার নায়কত্ব হারাতেও সময় লাগে না সাহিত্য, সিনেমা অথবা বাস্তব জীবনের ওই মানুষদের, কেননা সময়টা তখন অনন্ত কৌতূহলের, এবং অস্থিরতার। আজ যাকে ভেবে নিয়েছি নায়ক, তিনি কাল পর্যন্ত হয়তো টিকে থাকলেন, তারপর অন্য কেউ দখল করে নিলেন তার জায়গা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, তিনি ভিন্ন মানুষ। এই অনুচ্চ আকৃতির মানুষের দেশে তিনি কাঁধে মাথায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন, আক্ষরিক এবং গূঢ়— উভয় অর্থে। তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গীর ছিল সম্মোহনী ক্ষমতা। সিলেটের রেজিস্ট্রি মাঠে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঘি তুলতে হলে সোজা আঙ্গুলে হয় না, আঙ্গুল বাঁকা করতে হয়। বাঙালিরা এবার আঙ্গুল বাঁকা করবে, এবার পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানবে, বাঙালি কি জিনিস! কত ধানে কত চাল!

তাঁর প্রিয় বিষয় : বাঙালি এবং বাঙালির যৌক্তিক সংগ্রাম। তখনও তিনি অবশ্য বঙ্গবন্ধু নন, শুধুই মুজিব। শেখ মুজিব। কিন্তু জনসভা শেষে ঘরে ফিরতে ফিরতে মনে হয়েছিল, তিনি আজ আমার সামনে একটা দরজা খুলে দিলেন, যা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি, বিশ্বের মাঠে পা রাখতে পারি। শুধু আমাকে নয়, আমার অন্য যেসব বন্ধু সেদিন ওই জনসভায় উপস্থিত ছিল, সকলকেই সম্মোহিত করেছিলেন শেখ মুজিব। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, জাতি হিসাবে আমাদের যে ভবিষ্যৎ, তার কাণ্ডারি তিনি। এই প্রত্যয়টা খুব সহজভাবেই জেগেছিল আমাদের মধ্যে। কেননা, তাঁর আগে অনেক নেতাকেই আমরা দেখেছি। আমাদের পাড়া থেকে স্কুলে যাবার পথে পড়ত রেজিস্ট্রি মাঠ, এবং যতগুলো জনসভা হতো এই মাঠে– এবং সভাগুলো হতো স্কুল থেকে ফেরার সময়ে— আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণ সেগুলোতে যোগ দিতাম। বক্তৃতা শুনতাম। একবার মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শুনেছিলাম, বক্তৃতা শেষে তাঁর অটোগ্রাফও নিয়েছিলাম আমার

অটোগ্রাফের খাতায়। ভাসানীকে আমার মনে হয়েছিল খুব দয়ামায়ার একজন মানুষ, যেন ভিতর থেকে কষ্ট অনুভব করেন মানুষের জন্য। হাজী দানেশকেও সেরকম মনে হয়েছিল, তবে তাঁকে আমি দেখেছিলাম ঢাকাতে। ভাসানীকে আমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তি মনে হয়েছিল; তখন— এবং তার পরও–কেন জানি একথাও মনে হয়েছিল, রাজনীতির খেলাতে এরকম একজন মানুষ নিজের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবেন না। রাজনীতিকে ভাসানীর মতো মানুষরা ব্যবহার করতে পারেন না, রাজনীতিই বরং ব্যবহার করে তাঁদের। ভাসানীকে ব্যবহার করে অনেক মানুষ উপরে উঠেছেন, কিন্তু তাঁর আদর্শের পক্ষে কাজ করেছেন— এরকম মানুষ হাতে গোনা যায়। আজ যেসব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী মৌলবাদী দলগুলোর সঙ্গে জোট পাকিয়ে দেশটাকে একটা লেজেগোবরে অবস্থায় নিয়ে গেছেন, তাদের অনেকেই রাজনীতির মাঠে এসেছেন ভাসানীর হাত ধরে।

সিলেটের রেজিস্ট্রি মাঠ যদি হয় আমাদের রাজনীতির হালচাল জানার একটা জায়গা, তা'হলে তাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই, এবং এ মাঠের অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করার কোনো কারণও নেই। এ মাঠই আমাদের বলে দিয়েছে কারা, কোথায়, কেন রাজনীতি করছেন। এ মাঠে মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের গলাবাজি করতে দেখেছি, বামপন্থী নেতাদের তাত্ত্বিক বক্তৃতা শুনেছি; এ মাঠে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের কথা শুনেছি, ইসলামী বিপ্লবের আহ্বান শুনেছি, এমনকি পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের বক্তৃতাও শুনেছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণের কাছে সব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতিটি উচ্চারণের পেছনে ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং প্রত্যয়। কিন্তু একই সঙ্গে, পুরো বাঙালি জাতির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে সেই বক্তৃতায়। অনেক পরে ওই বক্তৃতা নিয়ে আমি ভেবেছি— কী ছিল তাতে, যে, চার পাঁচ তরুণকে–উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে– তা এমনভাবে স্পর্শ করে গেল, সেই প্রশ্নও করেছিলাম। কারিশমা কথাটা তখনও আমি জানতাম না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি যা ভেবেছিলাম, তা ওই কারিশমাই। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব, তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা, তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর— এ সবই ছিল ওই কারিশমার উপাদান। কিন্তু সিলেটের বক্তৃতাতে আরো কিছু ছিল, যা এতগুলো তরুণকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল। মনে রাখা দরকার, যতটা ভাবা হয়, তরুণরা তত সহজে ততটা প্রভাবিত হয় না। যদি না প্রভাবক শক্তিশালী বা মৌলিক হয়, অথবা, প্রভাবক ব্যক্তি হলেও মৌলিক হন। কেউ কেউ হয়তো শুধু কারিশমার গুণে তরুণদের প্রভাবিত করতে পারেন, তবে তা দীর্ঘদিনের জন্য সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন এবং বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে সেই দীর্ঘদিনের ব্যাপ্তি তাঁর দুর্বলতার সময়গুলোকেও ছাপিয়ে গেছে, অন্তত আমার কাছে— এভাবে একটা অভিঘাত রেখে যেতে হলে শুধু কারিশমাতে হয় না। আরো কিছু গুণ লাগে, এবং বঙ্গবন্ধুর সে সব গুণ ছিল।

সিলেটের ওই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে আমি অহংকার শুনেছি। সেটি জাতি হিসাবে আমাদের অহংকার, যে অহংকারটা এখনও আমি নিজের মধ্যে লালন করি। এখন আরো বেশি, কারণ পরিষ্কার দেখতে পাই যারা এখন দেশটা চালাচ্ছেন, তাদের অনেকের মধ্যে অহংকারের পরিবর্তে আছে সেই পুরনো হুজুরভক্তির মানসিকতা। পাকিস্তান আমলে কিছু বাঙালির মধ্যে পাকিস্তানীদের ভৃত্য হবার এবং ভৃত্য হিসেবে থাকার যে মানসিকতা আমি দেখেছি, সেটি এখন ফিরে এসেছে। এখন পাকিস্তানে গিয়ে টেলিভিশনে উর্দুতে সাক্ষাৎকার দেন দায়িত্বশীল ব্যক্তি–যিনি কিনা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখন মুক্তিযুদ্ধ একটা ভুল যুদ্ধ ছিল– এ কথাটাই শুধু বলার বাকি। বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতি হিসেবে অহংকারী হতে শিখিয়েছিলেন; এখন বঙ্গবন্ধুকে যেহেতু প্রত্যাখ্যান করছে ক্ষমতাসীনরা, এবং তাঁর নামটুকু মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে ইতিহাস থেকে, সেজন্য বঙ্গবন্ধুর অহংকারের মন্ত্রটাকেও ভুলে যেতে হবে।

সিলেটের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথার পেছনে সততা ছিল। তাঁর উচ্চারণ আর বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। তিনি সংগ্রামের ডাক দিয়ে ঘরে বসে থাকতেন না। কতবার তিনি জেলে গেছেন, তিনি নিজেও হয়তো গুণে বলতে পারতেন না। কাজেই তিনি যখন বক্তৃতার শেষে বলেছিলেন, 'তৈরি থাকুন, আর আঙ্গুলটা বাঁকা করে রাখুন', জেনেছিলাম, তিনিও তৈরি, এবং আঙ্গুলটা সবচেয়ে বেশি বাঁকা তিনিই করে রাখবেন। এই সামনে থাকার, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার বিষয়টা ছিল তাঁর জন্য স্বতঃসিদ্ধ।

ওই বক্তৃতার যে ভাষা, তা ছিল সহজ, অনাবিল এবং দেশীয়। 'আঙ্গুল বাঁকা করার' যে উৎপ্রেক্ষাগত বিষয়টি আমাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সেটি খুব সাধারণ লোকজ প্রজ্ঞা। জনজীবনের একেবারে ভেতর অঞ্চলে এর উৎপাদন। বঙ্গবন্ধুর যতগুলো বক্তৃতা শুনেছি, প্রায় প্রতিটিতে এইসব লোকজ চিন্তা, প্রবাদ-প্রচলন, বাগধারা এবং গ্রামীণ কৌতুকের প্রচুর ব্যবহার দেখেছি। তাঁর বক্তৃতায় কঠিন কোনো শব্দ কখনো শুনিনি, তাত্ত্বিক কোনো বাতাবরন তৈরির প্রয়াসও দেখিনি। অথচ কত সহজভাবে কত বড় বড় তত্ত্বের তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিপরীতে যখন তিনি জাতীয়তার ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দিতেন, তখন তাতে শানিত যুক্তি থাকত, এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে তাকে অকাট্য মনে হতো। বস্তুত সংস্কৃতির ভিতরে যে শক্তি আছে, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি তিনি ফিরিয়েছিলেন। যেখানে রেজিস্ট্রি মাঠের বক্তৃতাগুলোকে আমাদের পুনরাবৃত্ত চিন্তাভাবনার চর্চা বলে মনে হতো–যেন একটা ভাঙ্গা রেকর্ড প্রতিদিন একই জায়গায় বেজে যাচ্ছে— সেখানে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা আমাদের চমকে দিয়েছিল তাঁর সহজ সারল্যে, তাঁর লোকজ প্রজ্ঞার ব্যবহারে, তাঁর সক্রিয়তার আহ্বানে, বাঙালির পক্ষে তাঁর অহংকারী ও প্রত্যয়ী উচ্চারণে।

এই একই অনুভূতির— তবে শতগুণ বেশি তীব্রতায়— প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর একাত্তরের ৭ মার্চের বক্তৃতায়, এই তীব্রতার সপক্ষের প্রধান কারণ ছিল সময়। ১৯৬৫ (অথবা ১৯৬৬)-তে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা মাত্র— যদিও ততদিনে তিনি বাঙালির প্রধান মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দলটাকে গুছিয়ে, মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তিনি ছয়-দফা নিয়ে সংগ্রামে নামছেন মাত্র। কিন্তু ১৯৭১ সালে তিনি শুধু বাঙালির নয়, সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান নেতা— যেহেতু তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে দেশটির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ৭ মার্চ এসেছে ১ মার্চের পর, যেদিন জাতীয় সংসদ অধিবেশন মূলতবী করে জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অশুভ দাবাখেলার সূচনা করেছিল, এবং সারা বাংলাদেশ রাস্তায় নেমে এসেছিল প্রতিবাদে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তার গৌরব আর অহংকারের প্রতিরূপ। তিনি রেসকোর্সের মাঠে কি বললেন, তা জানার জন্য শুধু বাঙালি নয়, সারা বিশ্ব ছিল উৎসুক।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তৃতীয় বর্ষে। ১ তারিখ থেকেই আমাদের মধ্যে উত্তেজনা। প্রতিদিন মিছিল মিটিং হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে একটা বোঝাপড়ার দিকে আমরা এগুচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর জনসভাতেও গিয়েছি এক বিশাল মিছিলের অংশ হিসেবে। কিন্তু যে মহা মানব-সমুদ্রতে গিয়ে পড়লাম, তাতে মনে হলো, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ হয়তো শুনতে পারব, কিন্তু তাঁকে কাছে থেকে দেখতে পাব না। মঞ্চের সামনে যাবার কোনো উপায় নেই, কিন্তু আমার লক্ষ্য মঞ্চের যত কাছে যাওয়া যায়, তত। সাংবাদিকদের জন্য একটা বেষ্টনি ছিল, দেখলাম সাংবাদিকরা নোট-প্যাড নিয়ে, ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। এক বিদেশী সাংবাদিক এগোচ্ছিলেন সেদিকে, আমি তার সঙ্গে আলাপ জমালাম। হাতে কাগজ কলম নিয়ে তার পাশে পাশে হাঁটতে থাকলাম। বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকে পড়লাম— অথচ 'আমি সাংবাদিক' একথাটি কাউকে বলতে হলো না।

এখন মনে হয়, নিরাপত্তা বিষয়টাকে না বঙ্গবন্ধুর দল, না তিনি নিজে কখনো গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষই তাঁকে নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু মানুষ যখন অমানুষ হয়ে যায়, তখন এই বিশ্বাসটি আর টেকে না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি কিছু অমানুষদের হাতে মারা পড়েছিলেন–যে অমানুষগুলো পাকিস্তানীদের প্রতিহিংসাকে সফল করার জন্য নিজেদের বিবেক, মনুষ্যত্ব, নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জাতীয়তা— সব কিছু বিসর্জন দিয়েছিল। সে আরেক ইতিহাস।

৭ মার্চের ভাষণটি আমি মঞ্চের খুব কাছে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম, এবং এমনি সম্মোহিতের মতো যে, যে বিদেশী সাংবাদিকের সৌজন্যে আমি সেখানে ঢুকতে

পেরেছিলাম, তাঁকে ওই ভাষণের কিছু অংশ অনুবাদ করে শোনাতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। বেচারা সাংবাদিক। না সে জীবনে এত মানুষ একসাথে কোনো জনসভায় দেখেছে, না এমন বক্তৃতা শুনেছে। আমি যেটুকু তাকে বলছিলাম, তাতেই সে সন্তুষ্ট। জনসভার পরে আমাকে সে তার আবেগের কথাগুলো বলেছিল। 'হি স্পোক লাইক এ লিডার'– সে দু'বার এ কথাটা বলেছিল। অবশ্যই নেতার মতোই। আমি বঙ্গবন্ধুকে ভালো দেখতেও পাচ্ছিলাম। তাঁর সেই দীপ্ত তর্জনী উত্তোলনের ভঙ্গিটা এখনো আমার মনে আছে। আর মাথাটি একেকবার একদিক থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে মাঠের সকল মানুষকে দৃষ্টিসীমায় এনে তাঁর ভাষণ দেয়ার অননুকরণীয় ভঙ্গিমাটাও।

অনেক পরে এক জাতীয়তাবাদী মন্ত্রী জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কই, ৭ মার্চ কী এমন হয়েছিল?" এই প্রশ্নটি পাকিস্তানী জেনারেল, সেপাই-সান্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ীরা করলে বলার কিছু থাকে না। কোনো বাঙালি, একাত্তরে যে নিতান্ত শিশু ছিল, সে ছাড়া, এই প্রশ্ন করলে বুঝতে হবে বাঙালি হিসেবে আমাদের যত অহংকার আর গৌরব, তার কিছুই তার মধ্যে নেই। ৭ মার্চকে যারা অস্বীকার করে, তারা পাকিস্তানের সেবাদাস হতে পারলে আনন্দিত হয়, কিন্তু তা হতে গিয়ে বাঙালির যত গর্বের বিষয়, সবগুলো তাদেরকে অস্বীকার করতে হয়।

৭ মার্চের ভাষণটিকে আমি আমার জীবনে শোনা শ্রেষ্ঠ ভাষণ বলেই মনে করি। খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত সে ভাষণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তীব্র বিদ্যুৎ। মাঠে যারা ছিল তাদের প্রতিজন–দেশি এবং বিদেশি নির্বিবাদে–স্পৃষ্ট হয়েছে সেই বিদ্যুতে। বঙ্গবন্ধুর বাগ্মীতার এই বিদ্যুৎ মানুষের ভেতরের প্রাণটাকে জাগিয়ে দিয়েছে, ভেঙ্গে দিয়েছে সকল অচলায়তন। জনসভা থেকে বেরোতে সময় লেগেছে। দশ মিনিটের পথ আধঘন্টায় পাড়ি দিয়ে হোস্টেলে ফিরেছি এবং সারা সন্ধ্যা এই ভাষণের প্রতিধ্বনি শুনেছি নিজের মধ্যে। আমার মনে আছে, পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে সে সন্ধ্যায়, সে রাতে, যেন মানুষের ঢল নেমেছিল। মিছিল, স্লোগান। কিন্তু প্রত্যেকের ভেতরে যেন বিশাল একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার পথে পা রাখার প্রত্যয়মাখা এক অবস্থান বদলের। এখনো এরকম একটি বিশ্বোস আমি স্থিত যে, ৭ মার্চ বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছিল। কেউ কেউ, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী কিছু বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন, সেদিন বঙ্গবন্ধু তেমন কিছুই বলেন নি। কেউ কেউ এমন অনুযোগও করেছেন, বঙ্গবন্ধু কেন সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। কিন্তু আমার কাছে–এবং আমার সব বন্ধুর কাছে— এমনকি সেই বিদেশী সাংবাদিকের কাছে— বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার হয়ে ধরা দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালির

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন সেদিন। তিনি জানতেন, এই স্বাধীনতার অনিবার্য পরিণতি বাংলাদেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা। সেদিন যদি তিনি বলতেন, আজ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্বাধীন হলো, যুদ্ধ শুরু হলো, তাহলে কী হতো? পুরো আন্দোলনটা কি সেদিনই রুখে দেয়ার প্রয়াস চালাতো না পাকিস্তানীরা, গ্রেপ্তার করত না সকল নেতাকর্মীকে? বাংলাদেশের মানুষ যেটুকু সংগঠিত হতে পেরেছিল ২৬ মার্চ পর্যন্ত, সেটুকুও কি সম্ভব হতো? আর বিশ্বের যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিল এ দেশের মানুষ, তা কি পুরোটা পাওয়া যেত? ফ্রান্জ ফানোঁ একটা কথা তাঁর অনেক লেখাতে লিখেছিলেন, রাষ্ট্রিক (বা ভৌগোলিক) উপনিবেশমুক্তি যতটা কঠিন, তার থেকে বেশি কঠিন মনের উপনিবেশমুক্তি। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে মনের উপনিবেশমুক্তি ঘটিয়ে স্বাধীন হতে বলেছিলেন, এবং একইসঙ্গে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হতে বলেছিলেন 'তোমাদের যা কিছু আছে' বলতে তিনি লাঠি আর রামদা আর বল্লমের কথা বলেননি, বলেছিলেন বস্তুগত, মনোগত এবং কৌশলগত প্রস্তুতির কথা। বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণটি এখনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন অনেকে, কিন্তু এটি মূলত ছিল উদ্দীপক একটি মন্ত্র, যার উদ্দেশ্য স্বাধীনতার জন্য মানুষকে জাগানো। মানুষ জেগেছিল। বস্তুত ৭ মার্চের জনসভাটিই জানিয়ে দিয়েছিল এটি জাগ্রত লক্ষ মানুষের সম্মিলন। এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। যারা এই ভাষণটাকে উপেক্ষা করেন, তারা পাকিস্তানীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। তারা এ ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচারিত হতে দেয়নি। দিলে, সারা দেশেই স্বাধীনতার পক্ষে কী জোয়ার সৃষ্টি হয়, যার ফল কোথায় নিয়ে যায় সেদিন বা তার পরদিনের ইতিহাসকে, পাকিস্তানীরা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরুর পরপর ইয়াহিয়া খান যে বেতার ভাষণ দিয়েছিল, তা স্মরণ করুন। সে ভাষণে যত ক্রোধ, যত জিঘাংসা, যত হতাশা, তার সবটাই ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। আশ্চর্য, অনেক দিন পর বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশেরই কিছু মানুষ, যারা মন্ত্রী-উজির-নাজির-কোতোয়াল হয়েছেন বাংলাদেশের, তাদের কণ্ঠেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ওই একই ক্রোধ, একই জিঘাংসা শুনতে পাই, এবং আমাদের মনে পড়ে মহাকবি মিল্টনের এক অমর উক্তি, যদি অশুভ না টিকে থাকে, তাহলে শুভ'র মূল্য কতটা থাকে? যদি ইয়াহিয়ার ক্রোধ টিকে না থাকে, তাহলে বঙ্গবন্ধুর মহিমার কথাটা আমাদের কি প্রতিদিন মনে পড়ে?

দুই

বাঙালি জাতির ইতিহাসের নায়ক বঙ্গবন্ধু। এই ইতিহাসে তাঁর স্থান চির অমলিন, অমোঘ। তিনিই ছিলেন বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের ঘটনার রূপকার, বাঙালির দুঃসময়ের কাণ্ডারি, তার ইতিহাসের মহানায়ক। ওই স্থানটি শুধু তাঁরই

জন্য তোলা। তাঁকে যতই ভুলে যাবার, ভুলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা হোক, তাঁর জায়গায় (বা আরো মৌলিকভাবে হাস্যকর যা, তাঁর ওপরে) বসিয়ে দেয়ার কসরত করা হোক, তাতে লাভ কিছুই হবে না। ইতিহাস জানে কে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করে ইতিহাসের। কে রচনা করে আস্ত একটি বই; কে লেখে একটি প্যারাগ্রাফ, কে ফুট-নোট। ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে যে ক্রিকেট খেলা হতো, তা বিশ্ববাসী দেখত, কারণ ক্রিকেট এখন বৈশ্বিক একটি খেলা। তাতে সারা বিশ্বে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিল। এই ইর্ষা থেকে ক্রিকেট সরিয়ে নেয়া হলো বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে–গরিব দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ করে। তবে, আবারো বলি, বঙ্গবন্ধুকে এভাবে অবহেলা করার এবং ইতিহাসে তাঁর স্থানটি মুছে ফেলার প্রয়াসটি মৌলিকভাবে হাস্যকর। তা না হলে, পাকিস্তানীরাই তা পারত, এবং তা অনেক আগেই। বস্তুত, একাত্তরে বাংলাদেশে ছিল বা বাংলাদেশে ওই হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ছিল এরকম যত বেসামরিক বা সামরিক অফিসার আত্মজীবনীমূলক বই লিখেছে ওই সময়টি নিয়ে, তাতে বঙ্গবন্ধুই জুড়ে থাকেন পুরোটা জায়গা। এবং মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানীরা জানত কে তাদের অস্তিত্বের মূলে কুঠার চালিয়েছেন, এবং কেন চালিয়েছেন। আমার নিজের কাছে বঙ্গবন্ধুর স্থানটি নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তিনি বাঙালি মানসিক উপনিবেশমুক্তির রূপকার ছিলেন, স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের প্রধান শক্তি ছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি যখন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে, তিনি অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অনেক বিতর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, ওই পরিচয়গুলিই আমার কাছে বড় হয়ে রয়ে গেছে। আমি সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমানকে ভুলে যেতে পারি, কিন্তু বাঙালি জাতির কাণ্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ভুলতে পারি না। কেননা, আমাকে তাহলে নিজের পরিচয়টিই ভুলে যেতে হয়। কিন্তু তা তো হতে পারে না।

যেভাবে মুজিব হলেন 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক'

খোন্দকার মোজাম্মেল হক

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, খুব ভোরেই আমরা ফেনী থেকে দু'টো বাসযোগে ঢাকা রওনা হলাম। আমাদের দলনেতা ফেনীর রাজনৈতিক সম্রাট বলে পরিচিত খাজা আহমেদ। আমাদের বাসের উপরে মাইকের হর্ন। ভেতরে গণসঙ্গীত গাইছেন সফি ও বারী। কুমিল্লা সেনানিবাসের কাছে আসার পর আর্মিরা গাড়ি থামালো। সেনানিবাস এলাকায় গান বাজাতে নিষেধ করলো। আমরা সে নিষেধ অমান্য করেই বারীকে গান চালিয়ে যেতে বলি। আমি তখন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। সবেমাত্র গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব শাহীর পরাজয় ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী ও রাজবন্দীদের আগের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়া হয়েছে। আর সেদিনই বিকেলবেলা পল্টনে সব মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের সর্বদলীয়ভাবে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীও। কিন্তু এদিন বঙ্গবন্ধু পল্টনে যাননি। তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে। আয়োজক সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে সরকার এক তথ্য বিবরণীতে বলে যে তারা 'রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত' উদঘাটন করেছে। ছয়জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ আটজনকে আটক করা হয়েছে। দু'জন ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের অফিসার। এই বাঙালি অফিসাররা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় নাকি কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। আইয়ুব সরকার এই ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের আগে ঢাকা থেকে ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার মি. ওঝাকে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে বহিষ্কার করে। বোধকরি প্রেসনোটের দু'সপ্তাহ আগের ঘটনা এটা। ৮ জনকে আটকের প্রায় ১৬ দিন পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলার সাথে জড়ানো হয় এবং তাঁকে এক নম্বর আসামী করা হয়। কারাগারে

আটক আরো অনেককে এ মামলায় জড়িত করা হয়। মোট ৩৫ জনকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা সেনানিবাসের গোপন এজলাসে বিচার শুরু করা হয়। মামলার নাম দেয়া হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। তবে এটা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামেই পরিচিত ছিল।

তখনো শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' হননি। তখন 'ইত্তেফাক'সহ বেশ ক'টি পত্রিকা তাঁকে 'বঙ্গশার্দুল', 'বঙ্গবীর', 'বাংলার গণতন্ত্রের মানসপুত্র' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতেন। আমরা স্লোগান দিতাম 'মুজিব ভাইয়ের মুক্তি চাই', 'মুজিব তুমি এগিয়ে চলো— আমরা আছি তোমার সাথে', 'আমার ভাই তোমার ভাই–মুজিব ভাই মুজিব ভাই', 'আমার নেতা তোমার নেতা— শেখ মুজিব শেখ মুজিব'।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রায় সব নেতাই তখন কারাগারে। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা হলেন দফতর সম্পাদিকা আমেনা বেগম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অর্থ যোগানের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি কূপন ছাপে। আমরা সেগুলো গোপনে বিক্রি করতাম। কূপনে একটা বৃত্তের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছিল। এর সাথে লেখা ছিল, "আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই–শেখ মুজিব।" ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে বলতো, "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা।"

এই মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেয়ার সব আয়োজন শেষ করে এনেছিল আইয়ুব সরকার। যতটা মনে পড়ে মামলার প্রথম সাক্ষী ছিলেন রাজশাহীর আমির হোসেন। যাকে লন্ডন থেকে আসা কৌঁসুলি স্যার টমাস উইলিয়ামস্ ও এডভোকেট আবদুস সালাম খান জেরা করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আগরতলা ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের কোনদিকে অবস্থিত? জবাবে আমির হোসেন বলেছিলেন, দক্ষিণ পাশে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ফেনী-বিলোনীয়া রেললাইন ফেনী থেকে কোন দিকে গিয়েছে? আমির হোসেন বলেন, দক্ষিণ দিকে। মূলত ফেনীর উত্তর পাশেই আগরতলা ও বিলোনীয়া। দ্বিতীয় সাক্ষী ছিলেন ফেনীর কামাল উদ্দিন আহমেদ, আদালত তাকে বৈরী ঘোষণা করেন। তিনি আদালতে বলেন, সেনানিবাসে তার উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। তার গুহ্যদ্বারে গরম ডিম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় তাকে দিয়ে সাক্ষীর কাগজে সই করানো হয়। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রী খুকুকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছি কয়েকবার। তিনি আদালতকে বলেন, আমি কিছুই জানি না, পুরো মামলাটাই মিথ্যা ও সাজানো। আমাকে যেন আদালত থেকে বাড়ি যেতে দেয়া হয়। আদালত যেন আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। আদালত তার আবেদন গ্রহণ করে তাকে বৈরী ঘোষণা করে।

তখনকার পত্রিকায় এর বিবরণ আসতো প্রতিদিন। এই মামলা দিয়ে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে দলীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতায় পরিণত করলেন। বঙ্গবন্ধুর একটা আপোষহীন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। বাংলার নিঃস্ব, নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত গণমানুষের মহান নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু হয়ে যান 'সুপার গড'। পুরো মামলাটাই আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব গণআন্দোলনের তোড়ে ১৯৬৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যখন মামলাটি বাতিল করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন, তখন যা হবার হয়ে গেছে। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে জনতার হৃদয়-মন্দিরে বঙ্গবন্ধু তখন ঠাঁই করে নিয়েছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের গণসংবর্ধনাই তাঁর প্রথম প্রমাণ। এতো বড় মাঠ, মাত্র একদিনের মাইকিং-এ ভরে গেলো কানায় কানায়। জনতার বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোত পল্টন, নাজিমুদ্দিন রোড, এলিফ্যান্ট রোড, বিশ্ববিদ্যালয়, নিউমার্কেট এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে জনতার সামনে হাজির করতে গিয়ে বললেন, আপনারা যদি সম্মতি দেন, তবে বাংলার নিঃস্ব, নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত, অবহেলিত গণমানুষের বন্ধু, আপোষহীন জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' তথা বাংলার জনগণের বন্ধু খেতাব দিতে চাই। লাখো জনতা হাত তুলে করতালি ও মুহূর্মুহূ স্লোগানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নিলেন। টুঙ্গিপাড়ার মধুমতী তীরের সেই দুরন্ত বালক নিঃস্ব নিপীড়িত বাঙালি জাতির বন্ধু খেতাবে অভিষিক্ত হলেন। বিশ্লেষকদের রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকায় এত বড় জমায়েত এর আগে আর কখনো হয়নি।

সভায় যোগ দেয়ার আগে আড়াইটার দিকে জননেতা খাজা আহমেদসহ আমরা ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলাম। মোস্তফা হোসেন ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। একটু পরে একটা বটলগ্রীন কালারের হাফশার্ট ও লুঙ্গি পরে বঙ্গবন্ধু এলেন আমাদের মাঝে। তাঁর সাথে এলেন একজন সুদর্শন ক্যামেরাম্যান। পরে জেনেছি তিনি অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসা চলচ্চিত্রগ্রাহক এম.এ. সামাদ। বঙ্গবন্ধু আমাদের সবাইর সাথে হাত মেলালেন। আমাদের অনেকের চোখে তখন আনন্দাশ্রু। বঙ্গবন্ধু সবার মাঝে দাঁড়ালেন, সামাদ সাহেবকে বললেন, ছবি তোলো সামাদ। এরপর বললেন, সবাই খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে রেসকোর্সে চলে যাও। আমি ড. কামালসহ সভার বক্তব্য নিয়ে বসেছি। আবারো তিনি সবাইর সাথে করমর্দন করলেন। স্বপ্নের নায়ক বঙ্গবন্ধুকে এই প্রথমবারের মতো দেখলাম আমি।

ক'দিন পরেই পিণ্ডিতে সব দলের গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন জেনারেল আইয়ুব খান। মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে সেই বৈঠকে যেতে নিষেধ করলেন।

তিনি বললেন, "গোলটেবিলে যদি মজিবর যায়, তাহা হইলে ইহা হইবে বাংলার মানুষের সহিত একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা।" বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি গোলটেবিলে যাবো। সেখানে আমি বাংলার মানুষের অধিকার আদায় করবো।"

গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর চাপের মুখে আইয়ুব খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বন্টনের দাবি মেনে নেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেন, শাসনতন্ত্র নতুন করে রচনা করতে হবে। বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি ছয়-দফার আলোকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে; ছয়-দফার ব্যাপারে কোনো আপোষ নেই। এটা আইয়ুব খান, মাওলানা মওদুদী, মমতাজ দৌলতানাসহ অনেক নেতা মেনে নেননি। ফলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তেজগাঁ বিমানবন্দরে পান বীরোচিত সংবর্ধনা। তেজগাঁ বিমান বন্দরের নয়নাভিরাম সেই জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আচকান-পাজামা পরা কিছু স্বার্থপর নেতার জন্য বাংলার মানুষের দাবি আদায় বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব রাজনীতিকের উচিত রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো। এই বাংলায় আওয়ামী লীগ ও ছয়-দফা ছাড়া জনগণের সামনে বিকল্প কোনো দল নেই, বিকল্প কোনো দাবি নেই।" পরদিনই 'পাকিস্তান অবজারভার' লিখলো, "ইজ ইট শেখডোম" (এটা কি শেখের তালুকদারী)? 'অবজারভার' যাই লিখুন, তখন সারা বাংলায় আর কোনো স্রোত ছিল না। তখন "মুজিব মানেই শক্তি— মুজিব মানেই মুক্তি/মুজিব মানেই একতা— মুজিব মানেই জনতা/মুজিব মানেই বাঙালির মিত্র/মুজিব মানেই বাংলার মানচিত্র"– এমন কবিতা ছাপা শুরু হয়ে গেছে। বাঙালি খুঁজে পেয়েছে শত শতাব্দীর জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য তাদের মহান সিপাহসালারকে। সমগ্র জাতি একই মোহনায় মিলিত হয়ে গেছে। জাতির ঐক্যবদ্ধ এই জাতীয়তাবাদী স্রোতের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

আমরা মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়লাম। দেশের জনগণ এখন সর্বত্র উজ্জীবিত। এরই মধ্যে ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম র‍্যালী-মার্চ করার ঘোষণা দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো তিনি ৪১টি স্থানে কর্মীসভা, পথসভা ও জনসভায় ভাষণ দেবেন। সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ও সমাজসেবা সম্পাদক কে. এম. ওবায়দুর রহমান ফেনী রেলস্টেশনে বিকেল ৩টায় জমায়েতের কর্মসূচি লিখে আমাকে দিলেন খাজা সাহেবকে দেয়ার জন্য। সিরাজুল আলম খান ঠিক করলেন ৪১টি স্থান। এর মধ্যে অনেক স্থানে স্টেশনই নেই। বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হলো। দেশের মানুষ ৭২ ঘন্টা আগেই সর্বত্র অবস্থান নিতে থাকে। তাদের হৃদয়-মন্দিরের সেই মহান নেতা আসছেন তাদের মাঝে, শুধুই একটু দেখা, একটু শোনার জন্য গ্রাম-গঞ্জ থেকে রেললাইন অভিমুখে আগের দিনই মানুষের যাত্রা শুরু হয়।

এই কর্মসূচির পর সারা দেশেই বঙ্গবন্ধু সফরের কর্মসূচি দিয়েছিলেন। পিণ্ডিতে তখন অন্যরকম ষড়যন্ত্র। অপ্রতিরোধ্য মুজিবকে রোখার আর কোনো পথ নেই। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে অস্ত্রের মুখে পদত্যাগে বাধ্য করলেন। ২৪ মার্চ রাত ৯টায় রেডিও পাকিস্তান থেকে ইয়াহিয়া খান জংলি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, 'হ্যালো পাকিস্তানী' সম্বোধন করে। তিনি সারাদেশে সামরিক আইন জারি করলেন। সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হলো। রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ। পূর্ব পাকিস্তানে জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খানকে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস-এডমিরাল সৈয়দ মনজুরুল আহসানকে গভর্নর নিয়োগ করা হলো। আবার হোঁচট খেলো বাংলার মানুষ।

উনিশ শ' সত্তরের জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। অবশ্য তার আগে সেপ্টেম্বর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চালু ছিল। তখন রোববার ছুটির দিন হওয়ায় জনসভার তারিখ পড় রোববার। ১৯৭০ সালের ৪ জানুয়ারি রোববার প্রথমেই পল্টন ময়দানে জনসভা করলো আওয়ামী লীগ। সকাল থেকেই মাঠে জনস্রোত। দ্বিপ্রহরের মধ্যে পল্টন ভরে গিয়ে জনস্রোত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা-ঘাট। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। মঞ্চের পেছনে আওয়ামী লীগের ব্যানারের পাশেই বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'জয় বাংলা'। বঙ্গবন্ধু এ সভায় বললেন, নির্বাচনের তারিখ, নির্বাচন কীভাবে হবে তার রূপরেখা ঘোষণা করে ভোটার তালিকাকে হাল নাগাদ করতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না এলে বাংলার মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

পরের রোববার ১১ জানুয়ারি ছিল জামায়াতের জনসভা। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কাউকে বক্তৃতা দিতে দেয়নি। 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে তারা মঞ্চ দখল করে নেয়। সংঘর্ষ বেধে যায়। দু'জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। সভা পণ্ড হয়ে যায়। ১৮ জানুয়ারি রোববার জনসভা করে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি— পিডিপি। এর নেতা ছিলেন নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ ছেড়ে যাওয়া কিছু সুবিধাবাদী নেতা। ভাষা-আন্দোলনে ছাত্র-মিছিলে গুলীবর্ষণের নায়ক নুরুল আমিন সভায় বক্তব্য দিতে উঠলেই ছাত্রলীগ কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ছবি ও প্লেকার্ড নিয়ে মঞ্চ থেকে নুরুল আমিনসহ নেতারা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। জনগণ নুরুল আমিনকে জুতা-স্যান্ডেলও নিক্ষেপ করে। আফতাব আহমেদ বললেন, বাংলার মাটিতে কোনো মীর জাফরকে সভা করতে দেয়া হবে না। জনতা মুহূর্মুহু করতালি ও গগনবিদারী স্লোগানে মুখরিত করে তোলে পল্টন। 'জয়বাংলা' ও 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব' স্লোগান চলতে থাকে অবিরাম। তখন আমি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। তোফায়েল

আহমেদ আমাদের সভাপতি, আ.স.ম. আবদুর রব সাধারণ সম্পাদক ও শাহজাহান সিরাজ সাংগঠনিক সম্পাদক। আফতাব আহমেদসহ আমরা অনেকেই ছিলাম সিরাজুল আলম খান ও আ.ফ.ম. মাহবুবুল হকের সকল কার্যক্রমের সমর্থক। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের সম্মেলনে যখন তোফায়েল-রব প্যানেলের সাথে আল মুজাহিদী-মান্নান প্যানেল পরাজিত হয় তখন ফিরোজ নুন, আল মুজাহিদী প্রমুখরা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর নেতৃত্বে হল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলা ছাত্রলীগ গঠন করে। তারা বঙ্গবন্ধুর বদলে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেয়।

ছাত্রলীগের পরবর্তী সম্মেলন হলো ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল) মাঠে। ১৯৭০-এর মার্চে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বললেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পাকিস্তানের প্রতিটি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আগামী নির্বাচন, বাঙালির স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ কায়েমের আন্দোলনে ছাত্রলীগ আলোকবর্তিকার মতো দেশ ও জাতিকে পথ দেখিয়ে যাবো। সভামঞ্চে বসেই তিনি সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনির সাথে কথা বললেন, বোধকরি কীভাবে প্যানেল হওয়া উচিত তারই নির্দেশনা দিলেন।

১৯৭০ সালের ৬ মে তারিখে ডাকসু নির্বাচন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্রের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন। এটাও ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্য অগ্নিপরীক্ষা। ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যক্ষ ভোটে ছাত্রলীগের আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বাক ছিলেন শেখ শহীদুল ইসলাম।

উনিশ শ' সত্তর সালের পাঁচ ও ছয় জুন ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন। মতিঝিলের হোটেল ইডেনে এ সম্মেলনের মধ্যমনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ডেলিগেট সেশনে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি কোনো হস্তক্ষেপই করবো না। আপনারা গণতান্ত্রিকভাবে নেতা নির্বাচিত করবেন। আজ আপনাদের সামনে দু'জন তরুণ নেতাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এদের একজনকে সবাই চেনেন, তিনি ছয়-দফা, এগারো-দফা ও গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এখন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। এই তরুণ নেতার নাম তোফায়েল আহমেদ। তিনি তোফায়েল ও ফয়জুল হককে দাঁড়িয়ে সবার সাথে পরিচিত হতে বলেন। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং আবু হেনা কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিও হন বঙ্গবন্ধু, আর সাধারণ সম্পাদক হন তাজউদ্দিন আহমেদ। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাককে

সহসভাপতি ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন খলিল তিরমিজি, জি.এম. সাঈদ, মনজুরুল হক, মাস্টার খান গুলসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতা। তাদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ইংরেজিতে বক্তব্য রাখলেন প্রায় ৩০ মিনিট। আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর পক্ষে তার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলেন তিনি।

ছয় জুন রাতেই আনোয়ার রেস্টুরেন্টে সিরাজুল আলম খান লাল ও সবুজ কালারের লেডি হেমিলটন কাপড় এনে দিলেন দু'জন টেইলরের হাতে। বলাকা ভবনে বিহারীদের মালিকানাধীন 'নিউ পাক ফ্যাশন টেইলার্স'-এর লোক এরা। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (ইকবাল হল) ১১৮ নম্বর কক্ষে তখন কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাশ অঙ্কন করছেন একটা পতাকা। সবুজ জমিনের ভেতরে লালবৃত্ত। সিরাজুল আলম খান এসে বললেন, মুজিব ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে, আগামীকাল ৭ জুন সকালেই পল্টন ময়দানে সার্জেন্ট জহুর বাহিনীর প্যারেড হবে। তাতে এই পতাকা মুজিব ভাইয়ের হাতে তুলে দেবেন বাহিনী-প্রধান আ.স.ম. আবদুর রব। রাতেই পতাকা তৈরি হয়ে যায়। সিরাজুল আলম খান লালবৃত্তের মধ্যে সোনার বাংলার সোনালি মানচিত্র সংযোজন করতে বলেন। রাজ্জাক ভাই ও সিরাজুল আলম খান এ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলেন। খানের যুক্তি ছিল মানচিত্র থাকলে কেউ বলতে পারবে না এটা দুই বাংলাকে এক করার কোনো চক্রান্ত।

১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে পাকিস্তানি সৈন্যরা বন্দী অবস্থায় গুলি করে মেরেছিল। এই ঘটনাকে স্মরণে রেখে ১৯৭০-এর ৭ জুন জহুরবাহিনী পল্টনে প্যারেড করে। বঙ্গবন্ধু এই প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন। তাঁর দুই পাশে ছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ। বাঁশের মাথায় পতাকা বেঁধে প্যারেডে নেতৃত্ব দেন ডাকসুর ভিপি আ.স.ম. আবদুর রব। তিনি পতাকাটি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন। বঙ্গবন্ধু এটা ঢাকা মহানগরী ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ জাহিদ হোসেনের হাতে তুলে দেন।

সেদিন বিকেলেই রেসকোর্স ময়দানে ছিল জনসভা। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়হিয়া খান 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার' (এলএফও) বা আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশের অধীনে দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে অক্টোবর মাসে। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে তফসিলও ঘোষণা করেছে। ৭ জুন, ১৯৭০-এর রেসকোর্স আরেক জনসমুদ্র। 'ছয়-দফা দিবস' এই ৭ জুন। বঙ্গবন্ধু বললেন, যারা ঢাকায় আছেন, শহরে আছেন, আপনারা বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনকে ছয়-পয়সার একটা পোস্টকার্ড পাঠান। তাতে লিখে দিন, "বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সবাই যেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে

ভোট দেয়।" তিনি বলেন, আমার উপর যদি আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমি যাকে মনোনয়ন দেবো, তাকেই আপনারা ভোট দেবেন। আমি নেতা নই, আমি আপনাদের মতোই কর্মী। ঐ যে সামনে কবরে ঘুমিয়ে আছেন সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা, তারাই আমার নেতা। আজ থেকে আমি এই রেসকোর্সের নাম বদলে দিচ্ছি। এটা আজ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, আর 'আইয়ুব নগর' আজ থেকে পরিচিত হবে শেরেবাংলা নগর নামে। বক্তব্য শেষ করার আগে বললেন, কোনো উস্কানি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকবেন। বাঙালির আজকের ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে। বক্তব্য শেষ করলেন জয় সিন্ধু, জয় পাঞ্জাব, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় বাংলা ও জয় পাকিস্তান বলে। বোধকরি বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করলেন এই সভা থেকেই। সভামঞ্চে ছাত্রলীগ ও ডাকসুর পক্ষে বঙ্গবন্ধুকে মাল্যভূষিত করেছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব। মালার উপরও লেখা ছিল 'জয় বাংলা'।

১৯৭০-এর ৭ জুনের সভাটি শুরু হয়েছিল রাজকীয়ভাবে। সভার গুরুতেই বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করলেন ঘোষক সিরাজুল আলম খান। তিনি বললেন, ছয়-দফার প্রতীক হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন ছয়টি শ্বেতকপোত ওড়াবেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেয়া হলো একটি করে সাদা কবুতর। পাঁচটি কবুতর আকাশে উড়ে গেলেও একটা কবুতর বঙ্গবন্ধুর হাতে আবার ফিরে এলো।

বৃষ্টিভেজা রেসকোর্সে পাকিস্তানি নেতারাও ভিজে গেলেন। ছাত্রলীগ নেতাদের পাজামা-পাঞ্জাবি ও জামা-কাপড়ে লাগলো অনেক ময়লা। তবু ময়দানে যেন মানুষের ঢল নেমেছে। আগেই বলেছি, প্রেসিডেন্ট আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই আদেশে ৫টি ধারা ছিল। যেমন— পাকিস্তানের অখণ্ডতা, শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামী আদর্শ ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর ওড়ানো ছ'টি কবুতরের একটা তাঁরই হাতে ফিরে আসায় দৈনিক 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় আবদুল গাফফার চৌধুরী তার জনপ্রিয় 'তৃতীয় মত' কলামে লিখলেন, একটা পায়রা শেখ মুজিবের হাতে ফিরে আসায় মনে হচ্ছে ইয়াহিয়ার ৫ দফাই হয়ত টিকে থাকবে।

আবদুল গাফফার চৌধুরীকে আক্রমণ করে দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র খন্দকার আবদুল হামিদ 'স্পষ্টভাষী' কলামে গাফফার চৌধুরীর কড়া সমালোচনা করলেন। আবার 'তৃতীয় মত'-এ আবদুল হামিদকে একচোট নিলেন গাফফার চৌধুরী। খন্দকার আবদুল হামিদ তার কলামে আবারো আক্রমণ করলেন গাফফার চৌধুরীকে। এবার 'তৃতীয় মত' কলামে গাফফার চৌধুরী সরাসরি বঙ্গবন্ধুকে আক্রমণ করে লিখলেন, 'শেখ মুজিব আন্দোলনের ডাক দিয়ে সব সময় বাক্সপাটরা গুছিয়ে গ্রেফতারের আশায় বসে থাকেন।' তিনি বঙ্গবন্ধুর পলায়নমুখী মনোবৃত্তির

খুবই সমালোচনা করলেন। ক'দিন পর 'তৃতীয় মত'-এ গাফফার চৌধুরী লিখলেন, "শেখ মুজিব বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। তাকে বাঘ মেরেই নামতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে বাঘের পেটে।" উল্লেখ্য, বাঘ বলতে তিনি তখনকার জঙ্গি ও স্বাধীনতাকামী ছাত্র সমাজকেই বুঝিয়েছিলেন। হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন 'অবজারভার' পত্রিকায়ও 'জয় বাংলা' স্লোগানের কড়া সমালোচনা করা হয়, এ নিয়ে 'অবজারভারে' সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়। এতে বলা হয়, "যখনই জয় বাংলা স্লোগান শুনি, তখনই মনে হয় কিছু স্বেচ্ছাসেবক লাঠিসোঁটা ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে।" এ সময় এম. আর. আকতার মুকুল লিখতেন 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' নামে একটি কলাম। 'অবজারভার', 'পূর্বদেশ' ও 'চিত্রালীর' মালিক ছিলেন পিডিপি নেতা হামিদুল হক চৌধুরী। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কট্টর বিরোধী।

১৯৭০ সালের ২১ আগস্ট বলাকা ভবনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসে। নূরে আলম সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করছিলেন। রাত পর্যন্ত সভা চলতে থাকে। ৬২ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের মধ্যে ৪৫ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই চট্টগ্রামের স্বপন কুমার চৌধুরী (একাত্তরে শহীদ) যিনি আগে আমাদের কমিটির প্রচার-সম্পাদক ছিলেন, তিনি 'স্বাধীন' সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ–এর প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। ভোটে দেয়ার জন্য অনেকে প্রস্তাব করলেও সভাপতি বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা ছাড়া এমন প্রস্তাব পাস না করার পক্ষে মত দেন। কারণ, তিনি জানতেন ভোটে দিলে ৪৫ জনের মধ্যে বেশিরভাগই এর পক্ষে ভোট দিয়ে দিতো। মাত্র ১৩ জন সভায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী সভা মুলতবি ঘোষণা করে সবাইকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনে যান। বঙ্গবন্ধু সব শোনেন। একজন ছাত্রনেতা, সম্ভবত বদিউল আলম বলে ওঠলো, 'মুজিব ভাই এই প্রস্তাব আমরা ৩২ জনের ভোটে পাশ করেছি।' বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোরা স্বাধীনতা চাস, ভালো কথা। বাংলাদেশের মানুষকে প্রস্তুত হতে দে। মিটিংয়ে 'রেজুলেশন' নিয়ে তো স্বাধীনতা হয় না। গ্রামে–গঞ্জে যা, জনগণকে মটিভেট কর, তাদের সাথে কাজ কর। আগে নির্বাচনে দেখি কি হয়। নির্বাচনেই যদি সব পেয়ে যাই, তাহলে কেন অহেতুক ভেজালে যাবো?" এ সময় ছাত্রলীগ নেতারা স্লোগান তোলে— 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো— বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' বঙ্গবন্ধু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খবরদার এমন স্লোগান দেবা না, এটা কম্যুনিস্টদের স্লোগান। তোদের স্লোগান দে।' তখন বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ঠিক আছে, তোরা যা। আমি সিরাজের (সিরাজুল আলম খান) সাথে কথা বলে নেবো।'

নির্বাচন ঘনিয়ে আসে। সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের একজন করে নেতাকে প্রতিটি এলাকায় সমন্বয়কারী নিয়োগ করেন 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' থেকে।

আমাকে দেয়া হয় তার হোম-ডিস্ট্রিক্ট নোয়াখালীর নির্বাচন সমন্বয়কারীর দায়িত্ব। আমরা সারা দেশে নির্বাচন প্রার্থী খুঁজে বেড়াই। প্রাদেশিক পরিষদে মনোনয়ন দেয়ার মতো অনেক স্থানে প্রার্থীই খুঁজে পাই না। তবু শেষতক মনোনয়ন শেষ হয়। এবার নির্বাচনী প্রচার। সারাদেশে আওয়ামী লীগের দুটি পোস্টার লাগানো হয়। এর একটার শিরোনাম ছিলো 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' এতে পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি চিত্র ছিল। আরেকটা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার। এতে লেখা ছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ২০ টাকা মণ দরে চাল ও ১০ টাকা মণ দরে আটা দেবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করে দেবে। বক্তৃতার প্রয়োজন হতো না। পাশাপাশি দু'টি পোস্টারের ভাষা পড়লেই যে কোনো বাঙালির মাথায় আগুন ধরে যেতো। আমার দেশের সোনার ফসল চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ওরা আমাদের খাদ্য, পাট, কাগজ ইত্যাদি নিয়ে দেশ শাসন করে। আর আমরা তাদের গোলামের মতো থাকি। আমাদের সচিব করা হয় না, জেনারেল করা হয় না, আমাদের ভালো চাকরিতে নেয়া হয় না। আমরা আপন দেশেও গোলাম হয়ে আছি। এটা কারোরই সহ্য হবার কথা নয়। ছয়-দফা কর্মসূচি কণ্ঠস্থ করে আমরা নির্বাচনী সভায় পেশ করতে থাকি। জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের সবকটিতে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেয়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩শ' আসনেই মনোনয়ন দেয়া হয়।

নির্বাচন হবে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর তারিখে। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সংখ্যা ৭। আর এই তারিখেই পড়ে নির্বাচনের তারিখ। কিন্তু হঠাৎ করে ১২ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। এতে নোয়াখালী, বরিশাল, ভোলা ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ১০ লাখ মানুষ মারা যায়। সরকারি হিসাবে সাড়ে তিন লাখ।

পাকিস্তান সরকার কোনো রকম সতর্কবাণী বা পরবর্তীকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাহায্য দেয়নি।

সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. আবদুর রব, আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক, মাহবুব উল্লাহ, মাহফুজ উল্লাহ প্রমুখ কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের বাড়ি নোয়াখালীতে। আ.স.ম রব গিয়ে দেখেন রামগতির চরে লাশ ভাসছে। তার সাথে আসা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে তিনি ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেন। বলেন, 'লাশ ওঠাও কাঁধে। এখনো লাশ ভাসছে? প্রশাসনের কাজ কি?' বঙ্গবন্ধুকে যেতে দেয়া হলো না উপদ্রুত অঞ্চলে। চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ-হাতিয়া হয়ে মওলানা ভাসানী দেখে এলেন উপকূলীয় এলাকা। তিনি ফেরার পথে ফেনীর ডাক-বাংলোর মাঠে জনসভায় তাঁর দলের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেন। নির্বাচনে ভাসানী ন্যাপের প্রতীক ছিল 'ধানের শীষ'। আমি এডভোকেট নুরুল ইসলাম বাচ্চু মিয়ার বাসায় ভাসানীর সাথে

দেখা করলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা তো মজিবরের নৌকাকে পাহাড়ের উপর তুলে ফেলেছো, এখন ধাক্কা দিলেই কেল্লাফতে। আমার পরোক্ষ সমর্থন থাকবে মজিবরের প্রতি।'

ঢাকায় এসে তিনি পল্টনে জনসভা করে বলে দিলেন ইয়াহিয়ার সাথে কেবিনেটে যে ৭ জন বাঙালি মন্ত্রী আছে, ওরা এই বিপদের সময়ও আসেনি, তারা বেঈমান। বললেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা ওয়ালাইকুম সালাম।" তাঁর জনসভার চিত্রকল্প নিয়ে দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান লিখলেন কবিতা 'সফেদ পানজাবি'।

ঘূর্ণিঝড় কবলিত জেলাগুলোতে দু' সপ্তাহ পর নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে একটা বুকলেট দিয়েছিল 'ছয়-দফা কি ও কেন'। তার বিপরীতে জামায়াতে ইসলামীর একটা নির্বাচনী বুকলেট ছিল। 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ৬ দফা কর্মসূচি'। পিডিপি একটা বুকলেট ছাড়ে। এটার নাম ছিল, 'শক্তিশালী কেন্দ্রই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির রক্ষাকবচ।' মওলানা ভাসানী একটা স্লোগান তোলেন, ভোট বর্জন, 'ভোটের আগে ভাত চাই–নইলে এবার রক্ষা নাই।'

নির্বাচনের দিন সারাদেশে ছিল উৎসবের আমেজ। বঙ্গবন্ধু পুরানা পল্টনের কেন্দ্রীয় অফিসে বসে একটা রেডিও থেকে নির্বাচনের ফলাফল শোনেন। আমি তখন ফেনীতে। ফেনী প্রেসক্লাবের একটা টিভি ছিল। তাতে রাতভর ফলাফল ঘোষণা দেখি। সরকার কবির উদ্দিনই বেশির ভাগ ঘোষণা পাঠ করেন। তিনি শীট টান দিবার আগে থেকেই বলতে থাকতেন, "আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী...।" টিভি তিনটি ছায়াছবি, কয়েকটা নাটক ও কিছু গানের অনুষ্ঠানও প্রচার করে। 'বেদের মেয়ে' ছবিটি সে রাতে টিভিতেই দেখি। হঠাৎ হোঁচট খেলাম। ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া পিডিপি নেতা নুরুল আমিনের কাছে সামান্য ভোটে হেরে গেছেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় হাতী মার্কা নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে জিতেছেন। বঙ্গবন্ধু ত্রিদিব রায়কে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন, তিনি রাজি হননি। আওয়ামী লীগ মনোনীত চারু বিকাশ চাকমা এখানে পরাজিত হন।

প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফলও প্রায় একই রকম ছিল। একমাত্র সিলেটের সুনামগঞ্জে ন্যাপ (মোজাফফর)–এর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত জিতেছিলেন কুঁড়েঘর প্রতীক নিয়ে। ভোটের চিত্র এমনই ছিল যে প্রায় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা জামানত হারায়। ঢাকায় 'জয় বাংলা' স্লোগানের বিপরীতে 'জয় ঢাকা' স্লোগান নিয়ে নবাববাড়ি খাজা খায়ের উদ্দিন বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি পান ৪০ হাজারের মতো ভোট। ভোটের ব্যবধান ছিল এক লাখেরও বেশি।

একাত্তরের তিন জানুয়ারি রেসকোর্সে আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপিদের শপথ গ্রহণ করালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মঞ্চের আকৃতি ছিল নৌকার মতো। সকল সংসদ সদস্য ছিলেন নৌকার মঞ্চে। সামনে ছিল জনতার বিপুল সমুদ্র। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আজ এদের আমি শপথ গ্রহণ করালাম। এদের কেউ যদি কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করে, তাহলে তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেলবেন। আমি আপনাদের আজ সেই ক্ষমতা দিলাম।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, ছয়-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হবে। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে বাঁচাতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। ব্যাংক, বীমা ও পাটশিল্প ব্যক্তিমালিকানায় রাখা হবে না। এগুলো জাতীয়করণ করা হবে। বঙ্গবন্ধু ভাষণ শেষ করলেন 'জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' দিয়ে।

পরদিন ৪ জানুয়ারি (১৯৭১) ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। রমনা পার্কের বটমূলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতাদের সবাই থাকলেও সিরাজুল আলম খান উপস্থিত ছিলেন না। সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শাহজাহান ওরফে শাহজাহান সিরাজ সভায় থাকতে পারেননি 'পক্স' ওঠায়।

মঞ্চের সামনে দু'টি গ্রুপের শ্লোগান চললো। বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখেই প্রায় ২০ মিনিট যাবত এই শ্লোগান চলতে থাকে। এক গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা। অন্য গ্রুপের নেতৃত্বে নুরে আলম সিদ্দিকীর অনুসারীরা। খানের অনুসারীদের শ্লোগান ছিল : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'মুক্তির একই পথ–সশস্ত্র বিপ্লব', 'মুক্তি যদি পেতে চাও–হাতিয়ার তুলে নাও', 'তোমার আমার শেষ কথা–বাংলাদেশের স্বাধীনতা', 'পাকিস্তানে লাথি মারো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'শেখ মুজিবের মন্ত্র–সমাজতন্ত্র', 'স্বাধীন করো স্বাধীন করো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'পিণ্ডি না ঢাকা–ঢাকা ঢাকা' ইত্যাদি।

অপরদিকে সিদ্দিকীর অনুসারী গ্রুপের শ্লোগান ছিল, 'ছয় দফা মানতে হবে–নইলে গদী ছাড়তে হবে', 'শেখ মুজিবের মতবাদ–গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো বাঙালি– জাগো জাগো' ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু বেশ উপভোগ করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে একটু বিরক্ত বলে মনে হলো। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে বললেন, এগুলো সামাল দেয়া যাবে কি? বঙ্গবন্ধু সহাস্যে বললেন, "আপনি ভার্সিটির ডক্টরেট, আমি রাজপথের ডক্টরেট। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, 'তোমরা তোমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো বেগবান করো। তোমাদের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। এদেশকে শোষণমুক্ত করতে হলে তোমাদের অবশ্যই জেগে উঠতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগঠনে মতভেদ থাকবে, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে, নতুন নতুন স্লোগান আসবে, এগুলো গণতান্ত্রিক রাজনীতিরই চলমান প্রক্রিয়া।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১-এর বক্তব্য শেষ করলেন 'জয়বাংলা' বলে, বললেন না 'জয় পাকিস্তান'। এদিন থেকে বঙ্গবন্ধু আর কোনদিন 'জয় পাকিস্তান' উচ্চারণ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই ছাত্রদের স্লোগানই বাংলার নিপীড়িত-শোষিত জনতার কণ্ঠস্বর। বুঝতে পেরেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই এগুতে হবে।

উনিশশ' একাত্তরের মার্চের প্রথম দিন। রেডিও পাকিস্তান থেকে দুপুর একটার সংবাদে প্রচার করা হলো : মার্চের তিন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান স্থগিত ঘোষণা করেছেন। হোটেল পূবাণীর দিলকুশা হলে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভা চলছিল। খবর শোনার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সভা মূলতবি করলেন।

মুহূর্তেই সারা ঢাকা শহরে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়লো। ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান এমসিসি ক্রিকেট খেলা চলছিল, জনতা স্টেডিয়ামে আগুন-ধরিয়ে দিলো, খেলা পশু হয়ে গেলো। রাজপথে নেমে গেলো হাজার হাজার মানুষ। রাস্তাঘাটে যান চলাচল কমে গেলো। শহীদ মিনারে গিয়ে মওলানা ভাসানী বললেন, "আর কালবিলম্ব না করিয়া মজিবর তুমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কর।"

পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর দৃশ্য সর্বত্র। ঘরে ঘরে যেন ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজপথে জনগণের জিজ্ঞাসা, বঙ্গবন্ধু কি কর্মসূচি দিয়েছেন? বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বললেন, বিনা চ্যালেঞ্জে এটা ছেড়ে দেয়া হবে না। এটা বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। বললেন, সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। সাংবাদিকরা জানতে চাইলেন, আপনি কি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন? তিনি বললেন, "আপনারা অপেক্ষা করুন।"

বলাকা ভবন আর জহুরুল হক হলে দফায় দফায় বসছেন ছাত্র নেতারা। শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খান ঘুরে এলেন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে। এরপরই গঠিত হলো স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব আহবায়ক, সদস্য ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ডাকসুর জিএস আবদুল কুদ্দুস মাখন ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহন সিরাজ।

একটি যৌথ ঘোষণা প্রস্তুত হয়। ছাত্রলীগের জরুরি সভা ডাকা হয় জহুরুল হক হলে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে

স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও ৩ মার্চ পল্টনে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানেই স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করার সিদ্ধান্ত হয়।

১ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। ২ মার্চ ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল, ৩ মার্চ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভা। এতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা বললেন তিনি।

২ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনের চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রবেশপথের উপর পোর্টিকোতে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতারা দণ্ডায়মান। স্লোগান চলছে অবিরাম। জনতার বাঁধভাঙ্গা স্রোত আসছে। এই বিশাল জনস্রোতকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও ডাকসুর ভিপি আ.স.ম আবদুর রবের হাতে ঢাকা কলেজের নজরুল ও মহানগরী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জাহিদ একটি পতাকা তুলে দিলেন। এই সেই পতাকা যা গত ৭ জুন পল্টনের প্যারেডে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী বা সার্জেন্ট জহুর বাহিনীরই পতাকা। শিবনারায়ণ দাসের আঁকা এই পতাকাটি বাঁশের খুঁটিতে আটকিয়ে আনা হয়েছে। মুহুর্মুহু স্লোগান, করতালি আর গণসঙ্গীতের তালে তালে আ.স.ম. রব পতাকাটি উত্তোলন করলেন। ঘোষণা করলেন এটাই স্বাধীন বাংলার পতাকা। রবের কপালে ছিল রুমাল বাঁধা। এভাবেই পতাকা উত্তোলনের দৃশ্যটি পরদিন দৈনিক 'পাকিস্তান' সহ অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

২ মার্চ আধাবেলা হরতালের মধ্যে ঢাকা যেন মিছিলের নগরী। আবুজর গিফারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক ইকবাল-এর নেতৃত্বে রামপুরা থেকে মৌচাক সড়কে মিছিল করার সময় সামরিক কনভয় থেকে অবিরাম গুলীবর্ষণ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। সেখানেই ফারুক শহীদ হলেন। তাকে সেই সড়ক খুঁড়েই রাস্তা আটকে জানাজা পড়ে কবর দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বললেন, 'সাবধান! আমার দেশের কারো উপর গুলি চালাবা না। আর যদি গুলি কর, তোমরাও সেই গুলি থেকে রক্ষা পাবে না।' তিনি ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রতিদিন হরতাল এবং ৩ মার্চ শোক দিবস ঘোষণা করলেন। এদিকে ২ মার্চ রাতে আরো কয়েকজনকে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৫টি মৃতদেহ পাওয়া যায়। ৩ মার্চ দুপুর পর্যন্ত ৯টি লাশ পাওয়া যায়। আহত হন অনেকে। এসব মৃতদেহ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত লাখো জনতা জানাজায় অংশ নেন।

এর আগের কিছু কথা। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান প্রেস সেন্সরশীপ চালু করেন। সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সৈয়দ মনজুরুল আহসানকে বদলী করা হয়।

গভর্নরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় মিলিটারী সেক্রেটারী ও আঞ্চলিক সামরিক-আইন প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খানকে। এস. এম. আহসান গভর্নর থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর একটা সখ্য গড়ে ওঠেছিল।

২ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনোয়ার রেস্টুরেন্টে সিরাজুল আলম খান এলেন রাত ৯টায়। একটা কাগজে খসড়া কিছু লেখা ছিল। এটা নিয়ে এসে কয়েকজনকে বললেন, এটা একটু দেখে দাও তো, মুজিব ভাই দেখেছেন। এটাই কাল পল্টনে স্বাধীনতার ইশতেহার হিসাবে পড়া হবে। বললেন, জরুরি ভিত্তিতে এটা ছাপতে হবে। উপরে শিরোনাম ছিল 'জয়বাংলা ইশতেহার-১'। ব্র্যাকেটে ছিল, "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি।" শুরুতো এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। দু'এক লাইন পরে ছিলো, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করা হয়েছে।

৩ মার্চ পল্টনে লাখো ছাত্র-জনতার মহাসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এটা পাঠ করলেন। কথা ছিল সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এটা পাঠ করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ইশারায় শাহজাহান সিরাজকে ডেকে এটা পড়তে বললেন। এটাই স্বাধীনতার ইশতেহার। এদিনও সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হন। সভা শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ' ২৮ জন শিক্ষক ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও হত্যার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন।

৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আগেই ইশতেহার পাঠ করা হয়। গগণবিদারী স্লোগানের মধ্যে লাখো লাখো জনতার সামনে সেই ইশতেহার পাঠ করা হয়, তাতে কিছু কর্মসূচি ঘোষণা ছাড়া পল্টনের সমাবেশে সর্বসম্মত ১০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দশটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. আজকের এই মহাসমাবেশ বাংলার ৭ কোটি মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা করছে।

২. এই সভা সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জয়বাংলা-বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

৩. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আজকের ঘোষিত ইশতেহারকে অনুমোদন করছে।

৪. বাংলাদেশের গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

৫. "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করা হলো।

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হলো।

৭. সর্বত্র মুক্তি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

৮. 'জয় বাংলা' ধ্বনিই হবে স্বাধীন বাংলার জাতীয় ধ্বনি।

৯. এই সভা বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ঘোষণা করছে।

১০. সবুজ জমিনের উপরে লালবৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র সম্বলিত স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা পাকিস্তানি পতাকার স্থলে সর্বত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

দু'হাত তুলে করতালি ও স্লোগানের মাধ্যমে ১০টি প্রস্তাবই সিদ্ধান্ত আকারে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, 'অবিলম্বে বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সব অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। টিভি ও বেতারে আন্দোলনের খবর প্রচার না করলে বাঙালিরা তা বর্জন করে রাজপথে নেমে আসবেন। আন্দোলনরতদের উপর গুলি করে কাপুরুষের মতো যা করা হচ্ছে, তা আর বরদাশত করা হবে না। আন্দোলনের ফাঁকে দুষ্কৃতকারী কর্তৃক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনকে বানচালের ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি করার পরিণাম শুভ হবে না। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই।'

ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ সব দলের সংসদীয় পার্টির নেতাদের ঢাকায় বৈঠক আহ্বান করেন।

একাত্তরের ৪ মার্চ আওয়ামী লীগ এক নির্দেশে রেডিও পাকিস্তান টেলিভিশনের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন রাখে। বেতার ও টিভিতে জিন্দাবাদের পরিবর্তে 'জয় বাংলা' চালু করা হয়। সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। এদিন সারাদেশে সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ৪ মার্চ রাত পর্যন্ত তিন শতাধিক ছাত্র-জনতা শহীদ হয়। আহত হয় প্রায় ৪ শতাধিক। এইদিন নুরুল আমিনও ইয়াহিয়ার ১০ মার্চের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

৫ মার্চ ঢাকা মহানগরীর সব রাস্তায় ব্যারিকেডসহ নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হিসাবে 'বেলুচিস্তানের কসাই' হিসাবে খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করেন। টিক্কা খান সারা শহরে ট্যাংক মোতায়েন করে। বড় বড় ভবনের ছাদে মেশিনগান ও কামান বসানো হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন, শুধু ঢাকা ও আশেপাশে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩শ' নিহত ও দু'হাজার আহত হয়েছে।

৬ মার্চ ৩২ নম্বরে গেলেন ছাত্রনেতারা। বঙ্গবন্ধু তাদের আশ্বস্ত করলেন, তিনি সবই করবেন। হঠাৎ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ৭ মার্চ সকাল থেকেও তাঁর জ্বর

ছিল। ছাত্ররা তাঁকে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। বঙ্গবন্ধু দফায়-দফায় নেতাদের সাথে বসলেন, জেনারেল টিক্কা খানকে বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন ইয়াহিয়া খান।

৭ মার্চ সকাল থেকেই ঢাকা হয়ে গেলো মিছিলের নগরী। চারদিকে স্লোগান, চলো চলো রেসকোর্স চলো। রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর মিছিল ডিঙ্গিয়ে আসতেও সময় লাগলো। পৌনে তিনটার আগে তিনি পৌঁছতে পারলেন না। এদিন বঙ্গবন্ধুই একমাত্র বক্তা। সুর ধীরে ধীরে গদ্য কবিতার মতো চড়া হতে থাকে। আবেগ আর 'কনটেন্টে' বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 'টেস্টামেন্ট।' মাত্র ২২ মিনিটে বাঙালি জাতির ইতিহাসের সব আগাম নির্দেশনা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কবির মতো উচ্চারণ করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় তখন থেকেই 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের হলো।

বঙ্গবন্ধু ৮ মার্চ থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন।

অতঃপর আর বিলম্ব কিসের? নির্দেশ পাওয়া গেলো। শুরু হয়ে গেলো যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি। ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দূর্গ গড়ে উঠলো। ৮ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ। এদিকে গভর্নর টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানালেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিসহ সব বিচারপতি।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর ৮২ বলাকা ভবনে ছাত্রলীগ ৮ মার্চ সভা আহ্বান করে। ছাত্রলীগের নামের আগ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বাতিল করে 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নাম ঘোষণা দেয়া হয়। শুরু হয়ে যায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ। ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞান ভবন ও অস্ত্রাগারে সংগ্রাম পরিষদের অভিযান শুরু হয়ে যায়। ৯ মার্চ মওলানা ভাসানী বললেন, "আপোষের আর কোনো পথ খোলা নেই। শেখ মজিবরের প্রতি বাঙালিরা আস্থা রাখুন। মজিবর তুমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নেই, তুমি ৭ কোটি বাঙালির বীরনেতা হিসাবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনো।" এইদিন ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন তিনি ঢাকা আসবেন দুই-একদিনের মধ্যে।

১০ মার্চ টিক্কা খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু দেশের সকল দলের অনুরোধে অসহযোগের পাশাপাশি বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। কর্নেল ওসমানীকে অবসরপ্রাপ্ত ও বাঙালি সৈনিকদের সংগঠিত করার গোপন নির্দেশও প্রদান করেন এদিন। ১৫ মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর, আনসাররা মিছিলে অবতীর্ণ হন। অঘোষিতভাবে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন আগে থেকেই প্রশিক্ষণ চালিয়ে যায়।

মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা ডামি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং নিতে থাকে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে অস্ত্র জমা হতে থাকে। খশরু-মন্টু-সেলিম অস্ত্রের মহড়া শুরু করে দেন। সর্বত্র একটা যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

১৫ মার্চ কড়া সামরিক প্রহরায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসলেন। ২৩ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা দেয়া হলো। এদিকে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগ দেওয়ার শেষ দিন ছিলো ১৫ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কোনো কর্মচারীই কাজে যোগ দেননি। বিমানবন্দরে পাকিস্তানী অফিসারদের পরিবারের ভিড়। অনেকেই তাদের পরিবারকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে অনুমিত হলো।

১৫ মার্চ ভুট্টো এক বিবৃতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা বিশেষ ফর্মুলা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবেন। ফেডারেল পদ্ধতির সরকারের কেন্দ্রে একজন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে গভর্নর হাউজে (বঙ্গভবন) ইয়াহিয়া খানের আড়াই ঘন্টাব্যাপী বৈঠক হয়। এতে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা, ঢাকায় সংসদ অধিবেশন আহ্বান ও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দু'টি স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান।

এদিন চীন থেকে অস্ত্রবাহী একটা জাহাজ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে। বন্দর কর্মচারীরা এই অস্ত্র খালাসে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

১৭ মার্চ আবার বঙ্গবন্ধুর সাথে এক ঘন্টার বৈঠক হয় ইয়াহিয়া খানের। বঙ্গবন্ধু অন্তর্বর্তীকালীন যে কোনো সরকারের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনী ম্যান্ডেট মোতাবেক এখন আর কোনো পথ খোলা নেই। এখন ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এদের প্রথম কাজ হচ্ছে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা। ইয়াহিয়া খান সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি হামিদুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও সাবেক আইনমন্ত্রী এ. আর. কর্ণওয়ালিশকে ঢাকা আসার জন্য জরুরি তারবার্তা প্রেরণ করেন। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে বলেন, তিনি অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। শাসনতন্ত্র রচিত হবার পর নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করবেন।

১৮ মার্চও যথারীতি আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার জনগণের মূল দাবি না মেনে এটা একটা ধাপ্পা দেয়ার পাঁয়তারা। তিনি সরকারের গঠিত তদন্ত

কমিশন প্রত্যাখ্যান করেন। ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলার জনগণ কোনো চোরাবালিতে পা দেবে না। ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা শেষে ন্যাপ প্রধান আবদুল ওয়ালী খানের সাথে বৈঠকে বসেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে তিনি স্বীকার করেন যে, যদি ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা ও আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতৃত্বের কাছে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা ছেড়ে না দেন, তাহলে বাংলার জনগণ চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্র-জনতার ঘোষিত মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে একাত্ম হতে বাধ্য হবে।

১৯ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সাথে ৯০ মিনিটের বৈঠক হয় বঙ্গবন্ধুর। ঠিক একই সময় ঢাকার জয়দেবপুরে নিরস্ত্র গ্রামবাসীর উপর পাকিস্তানীবাহিনী নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করলে ২০ জন নিহত হয়। আর মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গুলিবর্ষণের ঘটনায় বঙ্গবন্ধু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ এবং সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে না নিলে আর আলোচনায় বসে লাভ হবে না।

এদিন ঢাকার রাজপথে জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি; খণ্ড-যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঢাকায় কার্ফ্যু জারি করে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ জারি করা হয়। সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হয়। বঙ্গবন্ধু অবাঙালি ও রিফিউজিদের উপর আক্রমণ না করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের জানমাল রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অবাঙালি সম্প্রদায় আনজুমানে মোহাজেরিন-এর সভাপতি এ জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরাও আপনাদের সাথে আছি।

এদিকে করাচিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন। তাঁর কিছু প্রশ্নের জবাব না পেলে তিনি ঢাকা যাবেন না বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যেহেতু দুই অঞ্চলে দুই দল ম্যাজরিটি, সেহেতু দুই দলের মিলিত বা কোয়ালিশন সরকার হতে পারে। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উপ-প্রধানমন্ত্রী তাঁকে করতে হবে। না হলে কোনো সমঝোতায় যাবেন না।

২০ মার্চ ইয়াহিয়া খান চাতুরির আশ্রয় নেন। তিনি সোয়া দুই ঘন্টার আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ছয়-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বলেন কেন্দ্রে কি কি থাকতে পারে, তা ভুট্টোসহ আলোচনা করে ঠিক করা হবে। ভুট্টো এদিন ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নেন।

২১ মার্চ ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর ৭০ মিনিটের অনির্ধারিত বৈঠক হয়। ভুট্টো দু'ঘন্টাব্যাপী ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক করে এসে বলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দাবিতে কোনো রকম ছাড় দিতে অস্বীকৃতি জানান।

২২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে ৭৫ মিনিটের একটি বিশেষ বৈঠক হয় ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর। শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মুজিব-ভুট্টোর একমত হবার লক্ষ্যে আবারও ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। এদিন ভুট্টো, ওয়ালী খান, এয়ার-মার্শাল আসগর খানসহ পাকিস্তানী নেতারা দফায় দফায় বৈঠকে মিলিত হন। দেশের প্রতিটি সংবাদপত্রে এদিন বাংলার স্বাধিকার শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এতে ৬-দফার আলোকে পাকিস্তানে আগামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা ছাপা হয়। দৈনিক 'ইত্তেফাকে' পুরো খসড়া সংবিধানই প্রকাশিত হয়।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের রিপাবলিকান দিবস। বাংলার জনগণ এটাকে প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রতিরক্ষা-বাহিনী কুচকাওয়াজ করে। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানের তালে তালে উড়তে থাকে স্বাধীন দেশের সোনালি মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা। স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা আ.স.ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ ও আবদুল কুদ্দুস মাখন অভিবাদন গ্রহণ করেন। সারা শহরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মহড়া, সভা, মিছিল ও শোভাযাত্রা।

এদিন ছাত্রলীগ নেতারা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে যান। বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ-বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু এদিন নিজ হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার সময়। বঙ্গবন্ধু বলেন, মূল সমস্যাবলীর প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। তোমরা এগিয়ে যাও। তোমাদের সাথে আমি আছি।

এদিকে এয়ার মার্শাল আসগর আলী খান বলেন, গভর্নর হাউজ ও সেনানিবাস ছাড়া পুরো চাকায় তিনি কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখেননি। চীনা দূতাবাসে তাদের পতাকা ছিল, তাও বদলে দেয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ। ইয়াহিয়ার নির্ধারিত জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের বৈঠক হয়। ভুট্টোর মন্তব্য, শেখ মুজিবের দাবির প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অচলাবস্থা কেটে যাবে। উপদেষ্টাদের সাথে দ্বিতীয়-দফা বৈঠক হয় আওয়ামী লীগ নেতাদের।

২৪ মার্চ একাত্তর ভুট্টো ব্যতীত পাকিস্তানের সব নেতা ঢাকা ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ তিনি বেতার ভাষণে সব পরিষ্কার করবেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিব ও ভুট্টোর সাথে আলোচনা সফল হয়েছে। একটি মতৈক্যের ফর্মূলা সে প্রেক্ষাপটেই তিনি দেবেন বেতার ভাষণে। ভুট্টো আরো দু' একদিন ঢাকা থাকবেন বলে ঘোষণা দেন। ২৫ মার্চ জেনারেল টিক্কা খানকে

হত্যাযজ্ঞ চালানোর যথাযথ আদেশ দিয়ে রাত সাড়ে আটটায় একই প্লেনে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

এদিন চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য মেজর জিয়াউর রহমানকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও কর্ণেল আবদুর রহমান ঝানজুয়া নির্দেশ দেন। ক্যাপ্টেন রফিকের নির্দেশে মধ্যপথ থেকে জনতা ও সৈন্যরা জিয়াকে ফিরিয়ে দেন। এদিকে বন্দরে অস্ত্র খালাসে বাঙালিদের বাধাদানের কারণে জনতার উপর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। চট্টগ্রামে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঢাকায় ঘুমন্ত জনতার উপর হানাদার বাহিনী নির্মম আক্রমণ চালায়। পিলখানা, রাজারবাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লাশের পর লাশ। চট্টগ্রামে সেনানিবাসে দুই হাজার বাঙালি সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়দেবপুর, রাজশাহী, যশোর ও রংপুরে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যসহ বিভিন্ন রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা মার্চের ১৯ তারিখ থেকেই প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সীমান্তের ইপিআর-এর বাঙালি সৈন্যরাও প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। তারা সবাই জানতো পাকিস্তানী সৈন্যরা অতর্কিত হামলা করতে পারে। তাদের নিরস্ত্র করা হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু এরই মধ্যে জানতে পারলেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া অতি গোপনে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। বঙ্গবন্ধু নেতাদের ডাকলেন। সবাইকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার গোপন নির্দেশ দিলেন। ২৫ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, ড. কামাল হোসেন, আবু হেনা কামরুজ্জামানসহ সিনিয়র নেতাদের তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া ধানমন্ডির ৩২ নম্বর ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। আবদুর রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে বিকেল থেকে টহল দিলেন। সারা মহানগরীতে থমথমে অবস্থা। বঙ্গবন্ধুকে মার্কিন দূতাবাস থেকে জানানো হলো, রাতেই সংঘর্ষ হতে পারে। বঙ্গবন্ধু সবাইকে বিদায় করে দিলেন। শত অনুনয়ের পরও তিনি যেতে রাজী হলেন না। বললেন, আমাকে না পেলে ওরা আক্রোশে ঢাকাসহ সারাদেশকে গোরস্তান বানিয়ে ফেলবে।

২৫ মার্চ রাত ৯টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসার দোতলার ডাইনিং টেবিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে নৈশভোজ সেরে নেন। তখনই নিচতলায় সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজসহ কয়েকজন সিনিয়র ছাত্রনেতা অপেক্ষা করছিলেন। তাদের সাথে কথা বলার জন্য বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে আসেন। তিনি

তাদের সাথে প্রায় দু'ঘন্টা কাটান। তারা বারবার অনুরোধ জানান, পরিবারকে নিরাপদে রেখে বঙ্গবন্ধু যেন তাদের সাথেই ধানমন্ডি ত্যাগ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা শোনেননি। তিনি তাদের নিরাপদে থাকতে ও যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। কে কোন পথে ঢাকা ত্যাগ করবে, সেটাও বলে দেন। রাত ১১টার দিকে শেখ হাসিনা নিচে নেমে বলেন, অবস্থা খুবই খারাপ, সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'আপনিও আসুন, বাবা, আমাদের যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধু বললেন, "মা হাসু, তোকে সারাদিন একটুও সময় দিতে পারিনি, চল কথা বলি।" রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাসার সামনে জটলা। একেএম মোশাররফ হোসেনসহ জাকারিয়া চৌধুরীর ছোটভাই ঝন্টু বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, মুজিব ভাই, পাকিস্তানী আর্মির কয়েকটি বহর এগিয়ে আসছে। আপনি সবাইকে নিয়ে সরে যান। ওরা না হয় আপনাকে মেরে ফেলবে।

বঙ্গবন্ধু এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন; বললেন, পাক সেনারা যদি তাঁকে মেরেও ফেলে তবু তিনি বাসা ছেড়ে যাবেন না। জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়াকে বললেন, 'তুমি যে বাসা ভাড়া করেছো সেখানে হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে এখুনি চলে যাও।' কামাল ও ল্যাফটেনেন্ট শেখ জামালকে বললেন, 'তোমাদের কাজ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা। সবাই বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। রাত ১২টার দিকে ওয়াজেদ মিয়া হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে চলে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য বাসা ঘিরে ফেলে। ব্ল্যাক আউটের মধ্যে তাদের গাড়ির আলো দোতলা থেকে দেখা যায়। ফিরোজুর রহমান ওলিও দৌড়ে দোতলায় উঠে যান। তখন বঙ্গবন্ধু আমিনুল হক বাদশা, চট্টগ্রামের এম.এ. হান্নান ও জহুর আহমেদ চৌধুরীর সাথে ফোনে কথা বলছিলেন। ওলিও জানান, যেকোনো সময় আর্মি বাসায় ঢুকতে পারে। চারদিক থেকে গণহত্যার খবর পাচ্ছিলেন তিনি। রাত সোয়া ১২টায় বঙ্গবন্ধু গোলাপী ও আকাশী রংয়ের দুই শিট কাগজ নিয়ে তাতে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে স্বাক্ষর করেন। আর তখনই ইপিআর-এর ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা রেকর্ড করা হয়। হানাদার বাহিনীর ওয়ারলেস ও বহিঃসমুদ্রে অবস্থিত জাহাজের ওয়ারলেসেও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শোনা যায়।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল বাংলা ও ইংরেজিতে, যা ওয়ারলেসে রেকর্ড হয় ১২টা ২০ মিনিটে। ঘোষণাটা নিম্নরূপ : "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানাস্থ ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশলাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান।

আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোষ নেই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক-প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা"

রাত পৌনে একটায় বঙ্গবন্ধু আরেকটি বার্তা ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাঠান। দ্বিতীয় বার্তায় তিনি বলেন— "এ আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানে থাকো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধ কর। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ ব্যক্তিকে না তাড়ানো ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"

ইপিআর-এর ওয়ারলেস অপারেটররা বঙ্গবন্ধুকে এই ঘোষণা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন। রাত সোয়া একটায় হানাদার বাহিনী চারদিক থেকে অনবরত গুলী চালাতে থাকে। প্রবল গুলীর মধ্যেও দোতলা থেকে একাই বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে চিৎকার দিয়ে বলেন, "স্টপ দিজ ননসেন্স। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?" সৈন্যরা তাঁকে গুলী করতে উদ্যত হলে কর্তব্যরত কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল জেড. এ. খান বলেন, "হুকুম হ্যায় জিন্দা পাকড়ানেকা"। তখন বঙ্গবন্ধু একটু সময় নিয়ে উপরে আসেন। তিনি ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেন। কারো সাথে কথা বলেননি। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত দেড়টায় তিনি সেনা-কনভয়ের গাড়িতে ওঠেন। এই ফাঁকে বেগম মুজিব, কামাল, জামাল ও রাসেলকে নিয়ে পাশের বাসায় চলে যান কাজের লোকজনসহ। রাত আড়াইটায় সেনারা বাসায় প্রবেশ করে লুটপাট চালায়।

টিক্কা খানের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, "যখন প্রথম গুলীবর্ষণ করা হয় তখন রেডিও পাকিস্তানে ক্ষীণভাবে শেখ মুজিবের কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। মনে হলো পূর্বে রেকর্ডকৃত বাণী। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন।"

সাংবাদিক মুসা সাদিক ও এডভোকেট রেজাউর রহমান পরবর্তীকালে জেনারেল টিক্কা খানের সে সাক্ষাৎকার নেন এবং যা 'মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম' গ্রন্থসহ দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়। তাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান বলেন, "আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছি। কারণ, শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভালো করেই চিনতাম। এ ঘোষণা ছিলো দেশদ্রোহিতা। এ ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ছিল না।"

বঙ্গবন্ধু ঢাকার বলদা গার্ডেনে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। এটাই রেডিও ওয়ারলেস সেট থেকে টিক্কা খান শুনতে পান। ২৬ মার্চ রাতে মগবাজার

ওয়ারলেসে কর্মরত ছিলেন সুপারভাইজার নুরুল আমিন। তিনি দ্বিতীয় ঘোষণাটি পান। এটা তিনি চট্টগ্রামের নন্দনকাননস্থ ওয়ারলেস অফিসের অপারেটর মাহতাব উদ্দিনকে দেন। মাহতাব ঘোষণাটি ২৫ মার্চ রাত ও ২৬ মার্চ প্রতিটি জেলার ওয়ারলেসে প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি বার্তাটি পত্রিকা অফিসে এবং বহিঃসমুদ্রের জাহাজেও প্রেরণ করেন।

২৬ মার্চ চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে টেলেক্স মারফত বঙ্গবন্ধুর মেসেজটি পৌঁছে। সম্পাদক মোহাম্মদ খালেদ ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি এটা চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু আটক হবার আগে স্বাধীনতার ঘোষণাটি তিনি চট্টগ্রামের এমপিএ জহুর আহমেদ চৌধুরীর বাসায় পাঠান। জহুর আহমেদ চৌধুরীর স্ত্রী ডা. নুরুন নাহার টেলিফোন মেসেজটি রেকর্ড করেন ছোট্ট টেপে এবং তা সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশনে প্রেরণ করেন। সেখানকার সহকারী প্রকৌশলী এস. এম. এ. হাকিম, জালাল আহমেদ, মাহফুজ আলীসহ কয়েকজন বহির্নোঙ্গরে অপেক্ষমাণ সামুদ্রিক জাহাজ, বাংলাদেশের সর্বত্র ও ভারতে প্রেরণ করেন। এভাবে ২৬ মার্চ রাত দ্বিপ্রহর থেকে পুরো দিন এটা ছড়িয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান ঘোষণাটি ইংরেজি ও বাংলায় প্রচার করতে থাকেন। বেতার কর্মীরাও বারবার তা পাঠ করতে থাকেন।

২৪ মার্চ চট্টগ্রামে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খান ও মিঠা খান বাঙালি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার ও তার একান্ত সচিব ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীকে উত্তেজনা সৃষ্টির অপরাধে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা নিয়ে আসে। তাঁর পদে কর্ণেল সিগরীকে নিয়োগ দেয়া হয়। এতেই সর্বত্র খবর হয়ে যায়। ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় শমসেরনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মেজর শাফায়াত জামিল ও কর্ণেল গাফফার পাকিস্তানীদের আটক করে নিরস্ত্র করে ফেলে। জয়দেবপুরে ২য় ইস্টবেঙ্গল মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। চট্টগ্রামে ইপিআর-এর উইং কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৫ মার্চ রাত ১টা ২০ মিনিটে বালুচ রেজিমেন্ট ইবিআর সেন্টার আক্রমণ করে। সেখানে ৮ম ও নবম ইস্টবেঙ্গল প্রশিক্ষণার্থীরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হানাদারদের হাতে অনেকে শহীদ হন। মেজর রফিকুল ইসলাম তিন শ' অবাঙালি ইপিআর সৈনিককে নিরস্ত্র করে পুরো চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এ সময় চট্টগ্রাম সেনানিবাসে হানাদারবাহিনী আক্রমণ করে সেনানিবাস দখল করে বহু বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করে। এদিকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে কয়েক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করে ২৫ মার্চ রাতেই। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া ১০২ জন

ইপিআর ও প্রশিক্ষণরত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিয়ে কুমিরায় রাস্তার পাশে অবস্থান নেন। শুভপুর থেকে কুমিরা পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে থাকে। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া গুলী ছোঁড়ার আদেশ দেন। রাত ৯টা পর্যন্ত দু'ঘন্টাব্যাপী এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের ১শ' ৫২ জন নিহত হয়। কুমিরার এই যুদ্ধই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম সামরিক যুদ্ধ। এতে ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন। ২৮ মার্চ পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। ২৫ মার্চ রাত ১১টায় ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্ণেল জানজুয়া ষোলশহরে মেজর জিয়াউর রহমানকে নির্দেশ দেন চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রবাহী সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করে আনতে। আগ্রাবাদ কলোনীর নিকট মেজর রফিকের বাহিনী তাদের থামায়। তখন জিয়ার বাহিনীর ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও শমসের মবিনকে দিয়ে জিয়াকে জানানো হয় যে, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যদের পাকিস্তানীরা হত্যা করছে। তখন জিয়াউর রহমান ষোলশহরে ফিরে এসে কর্ণেল জানজুয়াকে বন্দী করেন। জিয়ার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ প্রমুখ। এর আগে ২৪ মার্চ সোয়াত জাহাজে ৬৮ জন বাঙালি সৈন্যকে ২০ জন বালুচ সৈন্যের সাথে অস্ত্র খালাসে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ২৫ মার্চ আরো সৈন্য তাতে যোগ দেয়। যারা বাঙালি ছিলেন তাদের মধ্যে ছয়জন ছাড়া বাকি একশ' ১৪ জন বাঙালি সৈন্যকে ২৭ মার্চ বিকেলবেলা গুলী করে হানাদার বাহিনী হত্যা করে। সুবেদার রব ৬ জনকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরিয়ে বেঁচে যান। ২৫ মার্চ রাতে বাধাপ্রাপ্ত না হলে মেজর জিয়াকেও এদের মতো ভাগ্যবরণ করতে হতো।

২৫ মার্চ মধ্যরাতের দিকে (২৬ মার্চ) চট্টগ্রাম শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি মাতৃভূমি মুক্তির আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর সাথে সাথে বন্দর-নগরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নেমে যায় রাজপথে।

সারারাত পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে জনগণ রাইফেল লুট করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

শেখ মুজিবের অঙ্গীকার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এক

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) একটি মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন। এই মহাকাব্য জাতীয়তাবাদের। আরো নির্দিষ্টার্থে এ হচ্ছে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ও পরিণতিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।

সকলকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন, ছাপিয়ে উঠেছেন। কেন পারলেন? অন্যরা কেন পারলেন না? কেন পিছিয়ে গেল তারাও যারা বৈষয়িকভাবে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ছিল? প্রধান কারণ— সাহস। শেখ মুজিবের মতো সাহস আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি একাধিকবার ফিরে এসেছেন, আপোষ না করে। কিন্তু কেবল সাহসে হয় না, হবার নয়। সাহস ডাকাতেরও থাকতে পারে, থাকেও অনেক সময়। শেখ মুজিবের সাহস ব্যক্তিগত স্বার্থের পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয় নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি পরিচিত দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিপক্ষে। তিনি তাঁর দলের লোক ছিলেন, শ্রেণীরও ছিলেন। কিন্তু পার হয়ে গিয়েছিলেন ওই দুই সীমান্ত, পরিণত হয়েছিলেন জনগণের নেতায়। তাঁর সাহস জনগণের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করার জাতীয়তাবাদী সাহস।

সাহস মওলানা ভাসানীরও ছিল। তিনিও বাঙালির মুক্তির পক্ষে ছিলেন অনমনীয়। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার কথা তিনি সর্বপ্রথম বলেছিলেন, প্রকাশ্যে। কিন্তু পার্থক্য ছিল। ভাসানী পাকিস্তানী শাসকদের দেখেছেন, কিন্তু কেবল তাদেরকেই দেখেন নি, ওই শাসকদের পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনটাও দেখতে পেয়েছেন। দেখেছেন সামন্তবাদকেও। শেখ মুজিবের দেখাটা ছিল সেই তুলনায় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। যদিও সীমিত। তিনি পাকিস্তানী শাসকদের চিনেছেন, তাদের অধীনতা থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা এলে তার পরে কী ঘটবে সেটা তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল না, স্বাধীনতা ছাড়া অন্য সবকিছুই যে অসম্ভব এটা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেভাবেই কাজ করেছেন। পরের জিনিস পরে দেখা যাবে, ওই ছিল মনোভাব। লক্ষ্য নির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল বলেই তাঁর জন্য সাফল্য এল; মওলানার সাফল্যটা ছড়িয়ে গেল, কোনো কেন্দ্রীভূত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ

নিল না। তাছাড়া মওলানার একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতেন তাকে তিনি ভাবতেই পারতেন না ধর্মকে বাদ দিয়ে। পরিচ্ছন্ন সমাজতন্ত্র নয়, তার লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজতন্ত্র, যার দরুণ সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েও তিনি সামন্তবাদের প্রভাব থেকে যে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এমনটা বলা যাবে না। আমাদের অতীত ইতিহাসে একসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ঘটনা কম ঘটেছে, মওলানার ক্ষেত্রেও তা ঘটল না।

মওলানার ওই সমাজতন্ত্রের তুলনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ। ছিল তা ভাষাভিত্তিক, যে-ভাষা কোনো সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, সব বাঙালির মানসিক ও ব্যবহারিক সম্পদ বটে। এবং ওই জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে বেশ প্রবলভাবে। জাতীয়তাবাদের এই ধারা বিকশিত হবে এবং বিকশিত হয়ে এক সময় রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলবে, ডিমের ভেতরে শিশু যেমন ডিমের খোলসটাকে ভেঙে ফেলে, তার বিকাশের কারণে ও প্রয়োজনে, ঠিক তেমনিভাবে–এ ছিল অনিবার্য।

শুরু করেছে মধ্যবিত্তই। তাদের করবার কথা, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও তারাই করেছে। কিন্তু সেবার যেমন এবারও তেমনি, আন্দোলন সফল হয়েছে জনগণের অংশগ্রহণের কারণেই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করেছে মধ্যবিত্তই। করবার কথা তাদেরই। এই আন্দোলন তখনই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল, যখন তা ছড়িয়ে গেল গ্রাম পর্যন্ত। চুয়ান্নর নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়েছে মুসলিম লীগের বিপক্ষে। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের তারা ছিল প্রধান শক্তি। সত্তরের নির্বাচনে ভোট পড়ল পাকিস্তানিদের বিপক্ষে। জনগণের ভোট। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যে জয় সেটাও সম্ভব হয়েছে কৃষকের অংশগ্রহণের ফলেই। জনগণই পাকিস্তানকে এনেছিল, ভোট দিয়ে। তারাই পাকিস্তান ভাঙল, যুদ্ধ করে।

শেখ মুজিব মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন। উচ্চমধ্যবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত। প্রথম যখন ঢাকায় আসেন শহরে তাঁর থাকবার কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। কিন্তু ওই শ্রেণীতে তিনি আটকে থাকেন নি, বের হয়ে গেছেন, বের হয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছেন জনগণের নেতাতে, তার জোরটা ছিল ওইখানেই। কেবল মধ্যবিত্তের হলে ব্যক্তিগতভাবে উঠতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু মহাকাব্যের নায়ক হতে পারতেন না।

দুই

একাত্তরের পূর্বে এবং একাত্তরেও তাঁর শত্রু ছিল বাইরে। তখন রাষ্ট্র তাঁর শত্রু। রাষ্ট্রের শাসক, তার বিভিন্ন বাহিনী, তার আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী, সবাই তাঁর সাধারণ শত্রু।

মহাকাব্যের নায়কের যেমনটা থাকে, থাকবার কথা। কিন্তু বাহাত্তরের পর বদলে গেছে শত্রু-মিত্রের পরিচিতি ও অবস্থান। শত্রু তখন আর বাইরে নেই। চলে এসেছে ঘরের ভেতর। মহাকাব্যের নায়ক তখন পরিণত হয়েছেন ট্র্যাজেডির নায়কে।

বাহাত্তরের পরে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে প্রধানমন্ত্রী, তারপরে রাষ্ট্রপতি। তখন তিনি বন্দি হয়ে গেছেন তাঁর নিজের শ্রেণীতে, তখন ক্রমাগত তিনি বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন জনগণের কাছ থেকে। বাহাত্তরের জানুয়ারিতে তাঁর যে জনপ্রিয়তা তেমনটি বাংলার অন্য কোনো নেতা কখনো পান নি, ভবিষ্যতে পাবেন কিনা কে জানে! সেই সময়ে বিদেশী টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন কোন রাজনৈতিক নেতাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। শেখ মুজিব বলেছিলেন, তিনি স্মরণ করেন মাও সে তুঙ, লেনিন ও চার্চিলকে। মাও সে তুঙ যেমন করে কৃষককে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে এগিয়েছিলেন, শেখ মুজিবও তেমনি কৃষকের সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক যুদ্ধে। কিন্তু বিপরীত উপাদানও ছিল, ছিল মধ্যবিত্তের আকর্ষণ। লেনিন যা করেছেন শেখ মুজিবও তাই করতে চেয়েছিলেন, সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন একটি বিপ্লবকে। তিনি শ্রদ্ধা করতেন চার্চিলকেও যাঁর কাজ ভিন্ন প্রকারের, লক্ষ্য ভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই মধ্যবিত্ত সত্তাটি প্রবল হয়ে উঠল, বিদ্রোহী সত্তাকে ছাপিয়ে। তিনি বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলেন জনগণ থেকে। ফিরে গেলেন আপন শ্রেণীর কাছে।

পাকিস্তানি নিষ্পেষণকালে শত্রুকে চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। শত্রু ছিল রাষ্ট্র। মিত্র ছিল মধ্যবিত্ত ও জনগণ। মধ্যবিত্তের সেই অংশ প্রথমে আসে নি, যারা ছিল প্রতিষ্ঠিত, যারা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল এবং আরো পাবে বলে আশা করছিল; কিন্তু পরে তারাও এসেছে নতুন স্বপ্নে বুক বেঁধে। স্রোত হয়ে উঠেছে দুর্বার।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্র তাঁর শত্রু রইল না, কেননা তখন রাষ্ট্রের তিনি কর্ণধার। কিন্তু রাষ্ট্রকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবেন তাও পারলেন না। পাকিস্তান ছিল একটি আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র তার আগের চরিত্র ফেরত পেতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, এ চরিত্র মিত্রের নয়, শত্রুরই। কিন্তু তিনি চিনতে ভুল করলেন। শত্রুকে শত্রু বলে চিনলেন না। মধ্যবিত্তের যে-অংশ সুযোগ-সুবিধা পেল, ধনী হলো, উঠল ফুলে ও ফেঁপে, তারাও তাঁর মিত্র ছিল না। থাকবার কথা নয়। জনগণের যিনি নেতা তাঁর জন্য ওই শ্রেণী শ্রেণীগতভাবে মিত্র হতে পারে না। একেও চিনতে তিনি ভুল করলেন।

মহাকাব্যের নায়ককে তাঁরা শ্রেণীবন্দি করে ফেলল তাদের বৃত্তের মধ্যে। পাকিস্তানি শাসকরা শেখ মুজিবকে বহুবার আটক করেছে, কিন্তু বন্দি করতে পারে নি। আবদ্ধ অবস্থাতেও তিনি মুক্তই রয়ে গেছেন। জনগণের সঙ্গে থেকেছেন।

জনগণ থেকেছে তাঁর সঙ্গে। দ্বিতীয় বিপ্লব বলি, কিংবা বাকশালই বলি–এ হচ্ছে বন্দি মানুষের হতাশ পদক্ষেপ। ওই পদক্ষেপে তাঁকে আরো বেশি করে বিচ্ছিন্ন করল; তাঁর শক্তির প্রধান উৎস ছিল যে জনগণ–সেই জনগণের কাছ থেকে।

ঘাতকরা এই বিচ্ছিন্নতারই সুযোগ নিয়েছে। আঘাত করেছে। সপরিবারে তিনি নিহত হয়েছেন। একাত্তরে পাকিস্তানি শাসকেরা হাতের মুঠোতে পেয়েও তাঁকে আঘাত করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। কারণ জানত তারা যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে লক্ষ কোটি মানুষ আছে। মানুষের সেই বিক্ষোভের মুখে তাঁরা দাঁড়াতে পারবে না, বরঞ্চ নিজেরাই বিপদে পড়বে। পঁচাত্তরের ঘাতকেরা তাঁর গৃহে গিয়ে হানা দিয়েছে, তাঁদের হিসেবটা ছিল ওই রকমের যে, জনগণকে তারা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। রাষ্ট্রের পুরাতন যন্ত্রগুলো ছিল, তাদের তারা করায়ত্ত করল এবং কাজে লাগাল। ওদিকে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শ্রেণীর যেসব সদস্যের জন্য অত করেছেন তারাও সাড়া দিল না, বের হয়ে এল না রাজপথে, রুখে দাঁড়াল না সাহস করে। এই শ্রেণী এমনই করে। প্রয়োজনে বাবা ডাকে, অসুবিধা দেখলে ফেলে পালায়।

বাহাত্তরের পরে শেখ মুজিব শত্রু মনে করতেন বামপন্থীদেরকে। বামপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল বৈকি। কিন্তু বিরোধিতাটা ছিল আদর্শিক ও রাজনৈতিক। তারা আন্দোলন করেছে, ষড়যন্ত্র করে নি। ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর আশপাশের লোকেরাই। খন্দকার মোশতাক কমিউনিস্ট ছিলেন না, নন-কমিউনিস্টও নন, বড়াই করে বলতেন— তিনি হচ্ছেন এন্টি-কমিউনিস্ট। সেই এন্টি-কমিউনিস্টরাই ষড়যন্ত্র করেছে এবং হত্যা করেছে নায়ককে। তাদের কাছে শেখ মুজিব তখন আর গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তারা চাইছিল বাংলাদেশকে পরিণত করবে একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে; মুজিব সেই কাজে ঠিকমতো সহযোগিতা করছিলেন না। তাই তারা তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে। মধ্যবিত্তের যে অংশ অত্যন্ত স্ফীত হয়েছিল, শেখ মুজিব যাঁদেরকে তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় বলেছিলেন, 'চাটার দল,' তারা এতোটা ভারি হয়ে পড়েছিল যে নাড়াচাড়া করতে পারে নি, যেটুকু করেছে সেটুকু আত্মরক্ষার জন্য, কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে হাত মিলিয়েছে ঘাতকদের সঙ্গে।

ঘাতকেরা বলত তারাও মুক্তিযুদ্ধের লোক, নাকি তারাও অংশ নিয়েছিল ওই যুদ্ধে। হয়তো নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা হতে হলে মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী হতে হয়। মুক্তিযুদ্ধে সবাই যে চেতনার কারণে গেছে তা নয়, কেউ কেউ গেছে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে, কেউ গেছে মতলবে। তারাই মুক্তিযোদ্ধা যাদের মধ্যে ওই যুদ্ধের চেতনা ছিল। সেই চেতনার সংজ্ঞা পাওয়া যায় আমাদের আদি সংবিধানের চার মূলনীতিতে— বাঙালি জাতীয়তাবাদে, ধর্মনিরপেক্ষতায়, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে। চারটি একসঙ্গে থাকা চাই, নইলে বিকৃতি ঘটে প্রতিটিরই।

আওয়ামী লীগ প্রথমে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৫- তে সে 'মুসলিম' নাম ছেড়েছে। স্বাভাবিক ছিল এই প্রত্যাখ্যান। কেননা ১৯৫২-র পর যে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে শুরু করেছে— তাতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো জায়গা ছিল না। আমাদের স্মরণে আছে যে প্রবল একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটে গেছে ১৯০৫ -এর বঙ্গ বিভাগের পরে। সে ছিল প্রবল ও সৃষ্টিশীল। মধ্যবিত্তই শুরু করেছিল। সঙ্গে নিতে চেয়েছিল জনগণকে। না-নিয়ে উপায় ছিল না, কেননা জনগণের সমর্থন না পেলে ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এবং পরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু জনগণকে তারা ডাকবে কী করে? জনগণ তো কৃষক, বঙ্গভঙ্গের সে কী বোঝে? মধ্যবিত্ত তাই ডাক দিল ধর্মের ভাষায়। হিন্দু মধ্যবিত্তের সেই ডাকে হিন্দু জনগণ কিছুটা সাড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুসলমানের জন্য দূরত্ব ছিল একটি নয়, দু'টি। শ্রেণীর এবং সম্প্রদায়ের। বায়ান্নতে যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা তাতে ধর্ম ছিল না। এ ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ। গড়ে উঠেছিল সে ভাষার প্রশ্নে, যে-প্রশ্নে জনগণ সাড়া দিয়েছিল খুব সহজেই; কেননা ওই ভাষা তারও, ওই ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা তার আয়ত্তে ছিল না।

পঁচাত্তরের ঘাতকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আদৌ বিশ্বাস করত না। রাষ্ট্রকে তারা চালিত করতে চেয়েছিল বিপরীত দিকে। ভিন্ন নামে আরেকটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল তারা। তাদের 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কেবল একটি ধ্বনি নয়, এ ছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রের পথাভিসারী বাংলাদেশ তাদের জন্য অসহ্য ছিল। নিজেরা তারা ধার্মিক ছিল না মোটেও, ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল একটি আচ্ছাদন হিসেবে, যেমন চেয়েছিল তাদের পাকিস্তানি প্রভূ ও পূর্বসূরিরা। ঘাতকের পেছনেও ঘাতক ছিল। ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ। মওলানা ভাসানী যে-শত্রুদের কথা বলতেন, বামপন্থীরা যাদেরকে শত্রু বলে চেনেন।

শেখ মুজিবের অনুরাগী অনেক। কেউ কেউ অবশ্য অনুরাগ প্রকাশ করে সুবিধার আশায়। প্রকৃত অনুরাগী তারাই যারা তাঁকে দেখেন জনগণের নেতা হিসেবে । মুজিববাদের কথা বাহাত্তরের পরে শোনা যেত, এখন যায় না। মুজিববাদীদের অনেকেই এখন বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান নিয়েছে, নিজেদের সুবিধাবাদী চরিত্র গোপন করতে পারে নি। বাকশালের দুর্দান্ত সমর্থকদেরও দেখি এখন পুরনো আওয়াজ দেয় না। এরা শেখ মুজিবের মিত্র ছিল না, তাঁর সঙ্গে এরা যা করেছে সে-কাজটা শত্রুতার। মিত্রের বেশে শত্রুতার। শেখ মুজিবের প্রকৃত অনুরাগী তারাই যারা তাঁকে জনগণের নেতা হিসেবে চেনে এবং বাহাত্তরের পর থেকে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনবিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ করে দুঃখ পায়। জনগণের পক্ষে থাকার অর্থটা ভঙ্গিসর্বস্ব কিংবা বাকনির্ভর কোনো বিষয় হতে পারে না। পক্ষে

থাকার অর্থ হচ্ছে জনগণের অবস্থার পরিবর্তন আনা। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে যে-কঠিন বন্ধনে জনগণ আবদ্ধ সেটাকে বদলাবার চেষ্টাই হচ্ছে জনগণের পক্ষে থাকার স্মারকচিহ্ন। অন্যসব কিছু হয় আনুষঙ্গিক বিষয়, নয়তো ভঙ্গিই শুধু।

জাতীয়তাবাদ যে নিন্দার ঊর্ধ্বে তা মোটেও নয়। অনেকেই তা নিন্দা করেছেন এবং কারণও আছে। সঙ্গত কারণ। জাতীয়তাবাদ অন্ধত্ব, অহমিকা, জাতবৈরী ইত্যাদির সৃষ্টি করতে পারে। রূপ নিতে পারে আগ্রাসী। বিভ্রান্ত করতে পারে জনগণকে। তুমি আমার ভাই বলে বঞ্চিত মানুষটিকে সান্ত্বনা দিতে পারে, প্রতারণামূলক। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে বলেছেন। বলেছেন এ হচ্ছে এক অশুভ শক্তি। ভয়ঙ্কর। কিন্তু জাতীয়তাবাদের একটি প্রগতিশীল রূপ আছে। সেটি ছিল আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। এই আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। এর লক্ষ্য ছিল প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে শুধু ভোটাধিকার বোঝায় না, কেবল সহনশীলতাও নয়। বোঝায় সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং সেইসঙ্গে নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মেটানো। রবীন্দ্রনাথের উপমা ধার করে বলা যায়, এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রকে পরিণত করতে চায় ডিমের খোসায়। যার এমনিতে কোন দাম নেই, কিন্তু যে অত্যন্ত মূল্যবান ডিমের সার বস্তুটাকে রক্ষা করে।

শেখ মুজিব যে-জাতীয়তাবাদের নেতা ছিলেন মনে হয়েছিল যাবেন তিনি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ পর্যন্ত। যান নি। তিনি থেমে গেছেন এবং তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটোই সত্য। কিন্তু তিনি থাকবেন, মহাকাব্যের এই নায়কের মৃত্যু নেই। ভিন্ন নায়কেরা হয়তো আসবেন, ভিন্ন রূপে; কিন্তু তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নয়, তাঁর কাজটা যেখানে এসে থেমে গেছে সেখান থেকে ওই ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে শত্রু হিসেবে চিনে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে।

মুজিব মানে মুক্তি

কবীর চৌধুরী

কিছুদিন আগে বিবিসি-র এক জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রূপে। আমি ও সমমনা অনেক ক'জন অনেক কাল ধরেই তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করে আসছি। আমরা তখন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের কথা ভুলে যাই নি। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে-মানুষটি দীর্ঘ দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম, ত্যাগ, আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্বে মুক্তি সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়ে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য একটা মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ এনে দিতে পারেন, সর্বশ্রেষ্ঠের শিরোপা তাঁরই প্রাপ্য। বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্রষ্টা হবার কৃতিত্বের পাশে অন্য যে কোন মহৎ মানুষের মহান কীর্তি ম্লান হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু এ কাজটিই করেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন জাতির জনক, গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আমরা জানি যে কোন একক ব্যক্তি তার একার চেষ্টায় পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেন না। বহু সময় জুড়ে সেই সংগ্রাম চলে, বহু মানুষ সেই সংগ্রামে অংশ নেয়, বহু লোক তাতে আত্মাহুতি দেয়। তবু একথাও আমরা জানি যে, যে ইতিহাসের কোনো কোনো পর্বে কোথাও কোথাও একক ব্যক্তি এত বড় ভূমিকা পালন করেন, তাঁর অবদান এত কেন্দ্রীয় ও চূড়ান্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর কর্মকাণ্ড এত ফলপ্রসূ হয় যে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মাথায় জাতির পিতার শিরোপা পরিয়ে দেয়।

যে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর আমরা একটা মেকি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু দ্রুত মোহভঙ্গের পর ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বাঙালির সংগ্রামী তৎপরতায় শেখ

মুজিবের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্লাবী হয়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তানের এই অঞ্চলের ভিতকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্র।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের কতিপয় উচ্চ বিন্দুকে আমি এইভাবে চিহ্নিত করি। ছয়-দফা আন্দোলনে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে, যে-আন্দোলনকে বলা হয় বাঙালির ম্যাগনা কার্টা, তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংহত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি ঊনসত্তর ও সত্তরের গণআন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন, দুর্বার জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলেন এবং আমাদের চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্পকে তুঙ্গে নিয়ে যান, বজ্রকঠোর করে তোলেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত, পাকিস্তানী অবরোধকারী জল্লাদ বাহিনী কর্তৃক গণহত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পূর্ব নাগাদ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের মানুষের মুকুটবিহীন সম্রাট। সমগ্র জাতির ম্যান্ডেট পাওয়া, সর্বক্ষমতা প্রাপ্ত, একক প্রতিনিধি শেখ মুজিবের প্রতিটি নির্দেশ তখন সকল বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। প্রতিবাদী কোটি কোটি মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল, হাতে ছিল লাঠি, কোদাল, লাঙল, বেলচা, মুখে ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগান, কিন্তু একটি মানুষও উচ্ছৃঙ্খল হয় নি। বিশ্ব-ইতিহাসে এরকম ঘটনার নজির খুব বেশি নেই। ২৮শে মার্চ তারিখে লন্ডনের 'দি অবজার্ভার' পত্রিকায় তখনকার বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সাংবাদিক সিরিল ডান লিখেছিলেন : "Although it has taken Sheikh Mujibur Rahman more than twenty years to bring his life to its pre-sent stunning climax, the Iiberation of his homeland East Pakistan from its status as a colony of West Pakistan has always been his aim. Whatever may be said against him he is not a political opportunist." এসব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার যে অতুলনীয় আহ্বান জানিয়েছিলেন তার কথা। যার যা আছে তাই নিয়ে তিনি দেশের সব মানুষকে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন। তাঁর ওই ভাষণের মধ্যে ছিল সাহস, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও দেশবাসীর প্রতি গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হবার দিক নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অবিচল আস্থার কারণে সারা দেশের মানুষ তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন করেছে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়েছে, ২৫শে মার্চের কালরাত্রির পর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গ্রামেগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে,

হতদের সেবাশুশ্রূষা করেছে, গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য খবর সংগ্রহ করেছে, তাদেরকে শত্রুর ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ভূমিকা প্রসঙ্গে ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ তারিখে তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টিও উল্লেখ করতে হয়। ২৫শে মার্চ বিকালের দিকেই তিনি জানতে পারেন যে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং পাকবাহিনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার নির্দেশ দেন, কিন্তু নিজে তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে পালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এ প্রসঙ্গে মার্কিন লেখক রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে লিখেছেন : "মাঝরাত নাগাদ তিনি (বঙ্গবন্ধু) বুঝতে পারলেন যে ঘটনা প্রবাহ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর টেলিফোন অনবরত বেজে চলেছে, কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর দূর থেকে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে। তখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাকগুলি ও রাজারবাগ পুলিশ দপ্তর আক্রান্ত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর। তাই সে-রাতেই, ২৬শে মার্চে, তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য তিনি নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিফোন অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিক্টেশন দেন।"

রবার্ট পেইন লিখেছেন, বাণীটি ছিল নিম্নরূপ : "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।"

বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ওই ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁর সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে জেনারেল ওসমানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার সালিকের একটি বই-এর উল্লেখ করে বলেছেন যে ২৫শে মার্চ রাতে (ইংরেজি দিনপঞ্জি অনুযায়ী তখন ২৬শে মার্চ শুরু হয়ে গেছে) ব্রিগেডিয়ার সালিক যখন টিক্কা খানের সঙ্গে বসে ছিলেন তখন ওয়্যারলেসে ভেসে আসছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা।

১৯৭১-এর ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি ঘোষণা প্রচারিত হয়। ইংরেজিতে সে ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

"On behalf of our great national leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, I hereby pro-

claim the independence of Bangladesh. The government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of 7.5 million people of Bangladesh and the government headed by him is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and worthy of being recognized by all the governments of the world. May Allah help us. Joi Bangla."

জিয়ার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত এই ঘোষণাটি সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিকামী বহু মানুষকে, বিশেষভাবে বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর বহু সদস্যকে, প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এর জন্য প্রাপ্য সম্মান ও প্রশংসা জিয়াউর রহমানকে দিতেই হবে। তবে ইতিহাস বিকৃত করে এই ঘোষণা তিনি ২৬শে মার্চ প্রদান করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা অতিশয় ঘৃণ্য। কী পরিস্থিতিতে জিয়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন তাও সুবার জানা। তাছাড়া ১৯৭৫-এর মধ্য-আগস্ট পরবর্তী সময়ে তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির হয়ে কাজ করেন, যেভাবে রাজাকারদের রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করেন, যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানপন্থী ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে লিপ্ত হন, যেভাবে নিজের প্রাণ রক্ষাকারী কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলান, কয়েক শত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে হত্যা করেন, তাতে করে জিয়া নিজেই তাঁর একদা সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনকে ধূলায় লুটিয়ে দেন, আর তার ফলেই বাংলাদেশের কোটি মানুষের চোখে তিনি আজ একজন অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট প্রাণী ব্যতীত আর কিছু নন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের যে প্রবাসী সরকার গঠিত হয় তার রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর কতিপয় ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বঙ্গবন্ধুর নামেই তখন সরকার পরিচালনা করেন। জিয়াউর রহমানও বঙ্গবন্ধুর ওই সরকারের অধীনেই একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তখনও বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদানকারী মূল শক্তি। সফল মুক্তিযুদ্ধের শেষে মুক্ত স্বদেশে ফিরে এসে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির সামনে স্তূপীকৃত পর্বতপ্রমাণ সমস্যাদির সমাধানে তিনি অসামান্য দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য তাঁর আহ্বানে রণক্ষেত্র থেকে সদ্য প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যদের অস্ত্র সমর্পণ, অচিন্ত্যনীয় স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ভূখণ্ড ত্যাগ এবং আবারো অচিন্ত্যনীয় স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমুখী সংবিধান প্রণয়ন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র নব্বই দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহৃত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কি ঘটেছে তার কথা স্মরণ করলেই এ ঘটনার বিশাল তাৎপর্য অনুভূত হবে।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড় সাফল্য স্বাধীনতার নয় মাসের মধ্যে দেশকে একটি চমৎকার আধুনিক সংবিধান উপহার দেয়া। সংবিধান প্রণয়নে তাঁর ধ্যানধারণা ও নির্দেশনা যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তা সর্বজনবিদিত। এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চার মূল স্তম্ভের কথা বলা হয়েছিল : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদনের সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে এ বিষয়ে অতি স্বচ্ছ, যুক্তিনির্ভর, আলোকসঞ্চারী বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন সংগ্রামী ঐক্যের উপর।

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধগুলিকে তিনি যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি যে রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, ইতোপূর্বে আর কাউকে আমরা তেমন করতে দেখি নি। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি যখন বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করে উপযুক্ত মূল্যবোধসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখনই তাঁকে হত্যা করা হলো। কেন তাঁকে হত্যা করা হলো? কারা তাঁর হত্যার জন্য দায়ী? এটা ভাবা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তাধারার বিপরীত শক্তি, দেশি ও বিদেশি, এজন্য দায়ী। তাঁর আদর্শ ও কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আঘাত করেছিল অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে, বৃহৎ ব্যবসায়ী সমাজকে, আর সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য পদলেহী অনুচরদের। শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তো কখনো একা চলে না। তার অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা, দেশের ঐতিহ্যবর্জিত গণবিরোধী অপসংস্কৃতি। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রও বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সযত্নে সুকৌশলে বিস্তার করা হয় চক্রান্তের জাল। সেই চক্রান্তের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও জানা যায় নি, কিন্তু যতটুকু উদঘাটিত হয়েছে তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বঙ্গবন্ধু হত্যার ব্যাপারটি শুধু কয়েকজন তরুণ সামরিক অফিসারের অ্যাডভেঞ্চার প্রসূত ছিল না, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজশ ছিল দেশের ও বিদেশের, সামরিক ও বেসামরিক অনেক শক্তিধর পুরুষ ও সংস্থার।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়াউর রহমানের সরকার, এরশাদের সরকার, খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয় ইতিবাচক মূল্যবোধ খণ্ডিত, বিকৃত এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। এই সময়ে বাংলাদেশের সংবিধান কয়েকবার ধর্ষিত হয়েছে, ইতিহাসবিকৃতি অবিশ্বাস্য রূপ নিয়েছে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। বর্তমানে খালেদা-নিজামীদের জোট-সরকার বাংলাদেশকে একটি জঙ্গী মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বর্তমান সরকারের নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষ আজ প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধে ফুঁসে উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে চরম নৈরাজ্যের দিকে। কিন্তু আমরা তো নৈরাজ্য চাই না। আমরা চাই বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে–বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে। বঙ্গবন্ধু আজ সশীরে আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের স্মৃতি জ্যোতির্ময় শিখার মতো অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, খালেদা-নিজামীদের জোট-সরকার, বহু চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে কিন্তু পারে নি, কখনো পারবে না। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় :

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান ॥

আর, কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় :

মুজিব মানে আর কিছু না
মুজিব মানে মুক্তি,
পিতার সাথে সন্তানের
না-লেখা প্রেম চুক্তি ॥

ঢাকা,
১৮ আগস্ট, ২০০৪

বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন

আনিসুজামান

স্বনামধন্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্ত ১৯৪৩ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আট দশক (কলকাতা, ১৯৮৮; তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫) নামে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় তখনকার কথা বলেছেন এভাবে :

ছাত্ররা আমাদের অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা মুসলমান নই বলে যেন কোনো আঘাত না পাই তারও চেষ্টা করতেন। প্রায় সব ছাত্রই অবশ্য লীগপন্থী। পাকিস্তান-কামী। মুসলমান শিক্ষকেরাও তাই। তবে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে দুটো দল হতো— একটা বাংলাভাষীর দল আর অন্যটা উর্দুভাষীর দল। উর্দুভাষীরা নিজেদের একটু বেশি কুলীন মনে করতেন। কিন্তু বাংলাভাষীদের সংখ্যা ছিল বেশি। এই বাংলাভাষী দলের নেতা ছিল একটি কৃশকায় ছেলে— নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার নীতি শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই ছিল। বঙ্গবন্ধু মুজিবর বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে সফল হয়েছিলেন। ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওল্ড বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত। আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিয়ে যেত। (পৃ.১১৭)

বইয়ের অন্যত্র তিনি আবার উল্লেখ করেছেন দাঙ্গার সেই দিনগুলোর কথা : এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। (পৃ. ১৭৭)

ভবতোষ দত্তের এই কথাগুলোই আমার প্রবন্ধের ভূমিকা।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল মুসলিম লীগের কর্মীরূপে। মুসলিম লীগের তখনকার রাজনীতির মূলকথা ছিল দুটি : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রগঠন আর ভারতের প্রদেশগুলোর

স্বায়ত্তশাসনলাভ। সেই নতুন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন দেখা দিলো, মাউন্টব্যাটেন তখন স্পষ্টই বললেন জিন্নাহকে, তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে ভারত ভাগ করতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। জিন্নাহ্ প্রতিবাদ করে বললেন, তা কী করে হয়? ওরা তো আগে পাঞ্জাবি ও বাঙালি, পরে হিন্দু বা মুসলমান; তারা একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন করে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, সেকথা তো সকল ভারতবাসী সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। অগত্যা জিন্নাহ্ চুপ করে গেলেন। (ল্যারি কলিনস ও ডোমিনিক লাপিয়ের, 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট', নয়াদিল্লি, ১৯৭৬, পৃ ১০৪)। তবে তাঁর এই বক্তব্যই বোধহয় দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে প্রথম সরে আসা। এরপরে সরে এলেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি ও আবুল হাশিম একদিকে, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় এক ভাষাভাষী রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌম ও অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্‌বোধনী অধিবেশনে জিন্নাহ্ বললেন, এখন থেকে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তানের নাগরিক, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সর্বশেষ অধিবেশনে সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন প্রস্তাব করলেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরে রাজনৈতিক দলের দ্বার অমুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার, জিন্নাহ্ তখন সম্মত হলেন না। এমন কী, সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন নতুন রাজনৈতিক দল করলেন, তারও নাম দিলেন জিন্নাহ্ আওয়ামী মুসলিম লীগ।

লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের দুটো পৃথক রাষ্ট্র দাবি করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের সম্মেলনে তা বদলে একটা রাষ্ট্র করে দেওয়া হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে দেশের কর্ণধারেরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদে শায়েস্তা সোহ্‌রাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ্ বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মনে করছে যে, ওই অঞ্চলকে দেখা হবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে। তার কয়েকদিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করেন বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। মার্চ মাসে দেশের প্রথম বাজেট আলোচনার সময়ে একাধিক সদস্য পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা বলেন এবং মাহমুদ হুসেন দেশের প্রদেশগুলির জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' দাবি করেন।

এ সত্ত্বেও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষা, নাগরিক অধিকার ও সুশাসনের মতো বিষয়ে দেশবাসীর মধ্যে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এসব সংশয় দূর করেই কেবল যথাযথ লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হতে পারতো। সেই

সম্ভাবনা প্রথম দেখা দেয় ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনের একজন নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই সূত্রেই তিনি প্রথমবারের মতো কারাভোগ করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম লীগের যেসব নেতা ও কর্মীর মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাঁরা যখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন, তখন কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে তার একজন যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যায়, সেই ১৯৪৯ সালেই রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কী রকম মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

মুক্তিলাভ করে শেখ মুজিব সর্বক্ষণ ব্যয় করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজে। তবে কারাগারে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবু নিজের বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধ থেকে তিনি এতোটুকু সরে আসেন নি এবং নিজের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্‌বিগ্ন হন নি। বাইরে আন্দোলন করেছেন, জনমত গঠন করেছেন; সংগঠনকে আওয়ামী মুসলিম থেকে আওয়ামী লীগ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন; আবার গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বক্তৃতা করেছেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক নাম দিতে, যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের বিতর্ক পাঠ করলে এসব বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো স্মরণীয় বক্তৃতার সন্ধান পাওয়া যাবে। যখন তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী, তখনো তিনি কথা বলেছেন অকুতোভয়ে— কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাববে, পরিণাম কী হবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তার জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে জনগণের হৃদয়েও তাঁর স্থান হয়েছে বেশি করে।

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে আসসালামু আলাইকুম বললেন। তারপর স্বায়ত্তশাসন ও সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের প্রশ্নে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন: তিনি নিখিল পাকিস্তান-ভিত্তিতে দল গড়লেন, সমাজতন্ত্র চাইলেন, জোর দিলেন পররাষ্ট্রনীতির উপরে এবং সেই সূত্রে সমর্থন দিলেন সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নেতা। সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ছিলেন নমনীয়। শেখ মুজিব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন, সংখ্যার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি জানালেন এবং জোর দিলেন স্বায়ত্তশাসনের উপরে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে দেয় যে, পূর্ব বাংলা ছিল অরক্ষিত। তাতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ-অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ বাড়ে। শেখ মুজিব উপস্থাপন করেন ছয়-দফা দাবিনামা। বামপন্থী রাজনীতিকরা বললেন, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা।

সরকার বললো, এতে পাকিস্তানের সমূহ সর্বনাশ। কিন্তু পূর্ব বাংলায় মুজিবের নেতৃত্ব ও সংগঠন ক্রমশ সংহত হতে থাকলো। আইয়ুব খান রুজু করলেন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ওতেই কাজ হলো। শেখ মুজিবকেই মানুষ পূর্ব বাংলার একমাত্র স্বার্থরক্ষক হিসেবে দেখলো। ছাত্রেরা ছয়-দফাকে এগারো দফার অন্তর্ভুক্ত করে আন্দোলনে নামলো। সে আন্দোলনকে মওলানা ভাসানী সমর্থন করলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ূব বিদায় নিলেন, মুজিব বঙ্গবন্ধু হলেন। আইয়ুবের উত্তরাধিকারীরা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানতে বাধ্য হলেন এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

নির্বাচনও নির্বিঘ্নে হয়নি। 'ভোটের আগে ভাত' চেয়েছিলেন অনেকে, বলেছিলেন ব্যালট বাক্সে লাথি মারতে। তাতে সামরিক শাসন প্রলম্বিত হবে জেনেও তাঁরা উদবিগ্ন হন নি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আঘাত সহ্য করে পূর্ব বাংলা ভোট দিলো বঙ্গবন্ধুকে। তাঁর সমালোচকেরা বললেন, এবারে মুজিব আপস করবেন। আপস তিনি করেন নি, বরঞ্চ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের চব্বিশ দিনে পৃথিবী দেখেছিল এক অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন— এক নেতার ডাকে মাথা তুলে দাঁড়ালো পূর্ব বাংলা। এই সময়টা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সময়, আবার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষারও সময় অনেকগুলো বিকল্প থেকে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ছয়-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার পথ তিনি খুঁজেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্রমশই উপলব্ধি করছিলেন যে, সংকট সমাধানের সাংবিধানিক উপায় ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে তিনি এও জানতেন যে, দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। পাকিস্তান ভাঙ্গার এবং তার ফলে সম্ভাব্য রক্তপাতের দায়িত্ব তিনি নিতে চাইছিলেন না, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী হবে (একপক্ষীয় স্বাধীনতা-ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিরোধিতা করবে, তবে ভারত সমর্থন করবে, এটুকুই জানা ছিল), সে-সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তাই আলোচনার পথ খোলা রাখছিলেন। আবার ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ-আহ্বান কারো কাছেই অস্পষ্ট থাকে নি। তিনি কখনো আত্মগোপনের রাজনীতি করেন নি, তাই ২৫ মার্চ রাতে বাড়িতেই রয়ে গেলেন— যদিও জানতেন যে, পাকিস্তানিরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। এমন কী, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে-অংশটি পাকিস্তানের সঙ্গে আপসরফা করতে চেয়েছিল, তারাও বলতো, বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টাই তারা করছে। তাদের সে-প্রয়াস সফল হয়নি। বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক চাপে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান।

দেশে ফিরে এসে তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন পর্বতপ্রমাণ সমস্যার। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের পুনর্গঠন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, প্রাদেশিক সরকারকে জাতীয় প্রশাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করা, ঘাতক-দালালদের বিচার, যুদ্ধবন্দিদের বিচারের প্রশ্ন একদিকে, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি না পেলে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ছাড়া হবে না বলে ভুট্টোর হুমকি, ঘাতক-দালাল-সংক্রান্ত আইন বাতিল করার দাবি, আটক বাঙালিদের পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পরিবারের দাবি—এসব পরস্পরবিরোধী স্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছিল। ১৯৭১ সালে দেশের যে-তিনটি নীতি ঘোষিত হয়েছিল— গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—তার সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদ যোগ করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করালেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্পষ্টগোচর করাবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করালেন। নয় মাসে আমাদের সংবিধান প্রণীত হলো, আঠারো মাসের মাথায় সাধারণ নির্বাচন হলো। দেশের অবকাঠামো যতোটা সম্ভব পুনর্গঠন করা গেল। বহু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

তবে সময়টা আগের মতো ছিল না। দেশের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সমর্থক ছাত্রদের একটি বড় অংশ তাঁর আশীর্বাদলাভে ব্যর্থ হয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। বাংলাদেশবিরোধীরা মুক্তিযোদ্ধা-হত্যা থেকে পোস্ট অফিস লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অনুসারীদের সামলানোও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়লো। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো তাঁর সঙ্গে তাজউদ্দীনের দূরত্ব সৃষ্টি করতে একদল মানুষের সাফল্য। তাঁর প্রশাসনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্ন বিরূপতার কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সাফল্যের তালিকা দীর্ঘতর করা যেতে পারে, ওই বৈরী পরিস্থিতিতে তাঁর ব্যর্থতা বা ভুল সিদ্ধান্তের তালিকাও তৈরি করা যেতে পারে। তিনি মানুষ ছিলেন—ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। বাকশাল-গঠনের মতো তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলে তাঁর অনুরাগীদের অনেকে উত্তেজিত হয়ে যান। তাঁরা মনে করেন, এসব সমালোচনা বুঝি সপরিবারে বঙ্গবন্ধু-হত্যার মতো নিষ্ঠুরতম কাজের সাফাই। তা কখনো হতে পারে না। হত্যাকারীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের— একমাত্র অপরাধ ছিল বাংলাদেশের সৃষ্টি। একথা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের বোঝাতে চাওয়া বৃথা। যাঁরা বঙ্গবন্ধুকে ছোটো করার চেষ্টা করেন কিংবা আরো বড়ো করতে গিয়ে ছোটো করে ফেলেন, তাঁদের জানতে হবে, ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু অমরতা লাভ করেছেন, তিনি যা তিনি তাই, তাঁর আসন ধূলিমলিন হওয়ার নয়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

বিগত শতকের প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কালের একটি ঘটনা। ১৯০৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টে এক ইংরেজ বিচারকের এজলাসে একজন তরুণ বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের বিচার হচ্ছিল। অরবিন্দকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তথাকথিত আলিপুর বোমা মামলার আসামী হিসেবে। তৎকালীন বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন আসামী পক্ষের কৌঁসুলি। অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করে ব্যারিস্টার দাশ বিচারকের উদ্দেশে বলেছিলেন যে, আসামীর কাঠগড়ায় যাঁকে দাঁড় করানো হয়েছে তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন। ব্যারিস্টার দাশের ভাষায় তাঁকে বলা যেতে পারে "Poet of patriotism, prophet of nationalism and lover of humanity." স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কেও যদি একই কথা বলা যায় তা হলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বস্তুত আমাদের সময়কালে এক স্বতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয় চেতনার জাগরণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তানের জন্মের সময়কাল পর্যন্ত এই জাতীয় চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। বাংলার দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমান ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন হলেও প্রধানত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণে তারা এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া হঠাৎ করে শুরু হয়নি। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। আজ এ কথা ভেবে বিস্মিত হই যে, এই ভূখণ্ড যেটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথমে 'পূর্ব বাংলা' এবং পরে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল, সেটিকে ১৯৬৯ সালে 'বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই জাঁদরেল পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে। এ দেশের রাজনীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয়

সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় প্রবাহিত করার পেছনেও শেখ মুজিবের অবদান ছিল অনন্য। মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ, আবার আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে রূপান্তর— এ দেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার ধারক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনসাধারণ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ— হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলে একত্রিত হয়ে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়েছিল যেটা আগে কখনও হয়নি। বস্তুত এই সময় এই অঞ্চলের সর্বস্তরের বাঙালিদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল, যেটা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিগত স্বদেশী যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে আন্দোলনটা ছিল খণ্ডিত আন্দোলন। এর প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, তখনকার মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশ ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের যোগ না দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ভাষায়— 'তাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'(১)

গত কয়েক দশকে আমাদের সময়কালে এই অঞ্চলের বাঙালি মানসচেতনতায় যে অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেমের স্ফূরণ ঘটেছিল, সেই অনুভূতি ছিল একটা সামগ্রিক অনুভূতি, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান— সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যেটা সম্ভব হয়নি, আমাদের সময়কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছিল।

স্বদেশী যুগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আমাদের সময়কালের বাঙালি জাতীয়তাবাদের আর একটা মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, সেকালের স্বদেশী আমলের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেননি; তাঁদের জাতীয়তাবাদ ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, তাঁরা ব্রিটিশ-শাসিত সমগ্র ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সময়কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা ইতিহাসে এই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র

গঠন করতে সক্ষম হয়। বাঙালির সর্বকালের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। তিনি সুকৌশলে ধাপে ধাপে আমাদেরকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয়-দফার দাবির মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৬৯-৭০-এর গণঅভ্যুত্থানে সেটা এক-দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশবাসীকে ডাক দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' পাকিস্তানের জাঁদরেল সামরিক শাসকদের নাকের ডগায় বাস করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার আহ্বান আর কি হতে পারতো সে সময়? বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো তখন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে কোনো সেনাপতি বা সমরনায়কের ডাকে শুরু হয়নি। এটি ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি এবং এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বেচ্ছায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা দেয়ার পেছনে মনে হয় একটা কৌশলগত কারণ ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জনমতের সমর্থন লাভ করা সহজতর হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যদিও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন, তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো বঙ্গবন্ধুর নামেই পরিচালিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে এককভাবে দায়ী করেছিল। পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাঁর ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে দম্ভভরে ঘোষণা করেন :

'This man and his party are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attackd the solidarity and integrity of this country— this crime will not go unpunished.(2)

পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার পথ সুগম করার অপরাধে পাক সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের ভয়ে তারা সেই দণ্ড কার্যকর করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই শেখ মুজিবকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছবার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন

'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'(৩)

এই অসাধারণ ঘোষণার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র-চিন্তার মূলনীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল। বস্তুত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র— এই চারটি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়।(৪) এখানে এই চার মূলনীতির কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন এই কারণে যে, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এই মূলনীতিসমূহের অপব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এসেছে। প্রথমে জাতীয়তাবাদের কথা ধরা যাক। আবহমানকাল থেকে বাংলার জনগণ বহির্বিশ্বের কাছে বাঙালি বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সম্মিলিত চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান উৎস। এই জাতীয় চেতনা ধর্ম-ভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক নয়; এটি অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা, যেটি গড়ে উঠেছে এক অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। আবার আমাদের দেশে যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে, যেটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, সেটি ছিল প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল। অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তেমনি সমাজতন্ত্রকেও রাষ্ট্রের মূলনীতি করার পেছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের অন্যতম। এ দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে, মানবেতর জীবনযাপন করছে; অশিক্ষা, অনাহার ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এই সকল বিপন্ন অসহায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন একমাত্র কোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। বস্তুত আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে এই সমাজতন্ত্র যে নিছক টেকস্টবুক সোশিয়ালিজম বা কেতাবী সমাজতন্ত্র, কিংবা সোভিয়েত রাশিয়া, গণচীন বা কোনো বিদেশী মডেল অনুযায়ী হবে না— এ

ব্যাপারে আমার ধারণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে জনগণের বৃহত্তম অংশের জীবনযাত্রার ন্যূনতম চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়। এ জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দিতে হবে। উভয়ের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ সুগম হবে।

এসব সমস্যা নিয়ে যখন আওয়ামী লীগ সরকারি মহলে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছিল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল এবং এর ফলে কিছুটা সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল, ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক, যারা নানাবিধ কারণে সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল, তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেষ রাতে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করে। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের ভেতরেই খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে একটি চক্র বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত ছিল। এই চক্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শত্রুদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বস্তুত বাংলাদেশের ভেতরেই কিছু সংখ্যক লোক ছিল যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে এবং পুরোপুরি পাকিস্তানপন্থী। তারা অনেকেই পাক হানাদার-বাহিনীর দোসর ছিল। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাকিস্তানের প্রতি অনুরক্ত এক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে খন্দকার মোশতাক ও তাঁর অনুসারীদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সেটা এখন প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই ফল।

এই অভ্যুত্থানের পর খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীকে, বলা যেতে পারে বন্দুকের নলের মুখে, বঙ্গভবনে ধরে নিয়ে এসে মোশতাকের অধীনে মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করানো হলো। কিন্তু মোশতাক ছিলেন নামে-মাত্র প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। আসলে গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সামরিক গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছিল। এ বছরেই নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে চার শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলি এবং কামরুজ্জামান—যাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং যাঁরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদেরকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যে হত্যাকারী সামরিক গোষ্ঠী ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল সেই একই গোষ্ঠী দ্বারা জেল-হত্যা সংঘটিত

হয়েছিল। এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে গোটা জাতি হতচকিত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এরপর ঢাকা সেনানিবাসে কয়েকটি অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থান হয়ে যাবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা হস্তগত করেন।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রকারান্তরে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এভাবে শুরু হয় রাষ্ট্রের মিলিটারাইজেশন বা সামরিকীকরণ। পাকিস্তানি ভাবাপন্ন বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করতে উঠে পড়ে লাগে। পাকিস্তানি ভাবধারাকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাকিস্তানি কায়দায় ইসলামীকরণের প্রক্রিয়াও সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সামরিক-শাসকরা যখন বুঝতে পারলো যে, এ দেশের জনগণ এবং বিশ্ব সম্প্রদায় সামরিক শাসন পছন্দ করে না, তখন তারা সুকৌশলে বেসামরিক ছদ্মবেশ ধারণ করে সেনানিবাসে বসেই রাজনৈতিক দল গঠন করলো। সেনানায়করা বেসামরিক পোশাক পরিধান করে রাতারাতি জননেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে জন্ম হয় পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা 'বিএনপি' এবং 'জাতীয় পার্টি'। আর এভাবে সামরিক-বাহিনীর দুই সেনাপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় নেতা হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

কিন্তু বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে মূলত কোনো প্রভেদ ছিল না। এদের উভয়ের জন্ম ক্যান্টনমেন্টে। সুতরাং বলা যায়, এরা এক মায়ের দুই সন্তান। এই দুই দলের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, এদের চরিত্র এক এবং অভিন্ন। এরা উভয়ই বাঙালি জাতিসত্তার বিপক্ষ শক্তি এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের ধ্বংসকারী। যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংগ্রাম করে এসেছিল, সেই বাঙালি জাতিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে করা হয়। বস্তুত ১৯৭৫-এর পর দীর্ঘ একুশ বছর বিএনপি ও জাতীয় পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এদের আমলে পরিকল্পিতভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ইসলামীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করার অপচেষ্টা করা হয়। জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযুক্ত করলেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আর এক ধাপ এগিয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করলেন। এর ফলে আদর্শ ও চরিত্রের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তফাত থাকলো না। এরপর বেগম খালেদা জিয়ার

নেতৃত্বে বিএনপি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানিকরণের প্রক্রিয়া আরও জোরে-শোরে শুরু করলেন।

দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আওয়ামী লীগ তার পাঁচ বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামীকরণের প্রক্রিয়াকে বহাল রেখেছিল। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য সামরিক-শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করার পর বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলে তার স্থলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জেনারেল জিয়া 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে বক্তৃতা শুরু করার রেওয়াজও চালু করলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫-এর পূর্বে বঙ্গবন্ধু বা অন্য কোনো নেতা রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে বক্তৃতা শুরু করতেন না। এমন কি পাকিস্তান আমলেও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান বা শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ কোনো রাজনৈতিক নেতা তাঁদের বক্তৃতায় 'বিসমিল্লাহ' ব্যবহার করতেন না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অত্যন্ত কুমতলবের বশবর্তী হয়ে জিয়াউর রহমান এই রেওয়াজটি চালু করেন। শুধু তাই নয়, সকল সভা ও অনুষ্ঠান কোরান তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করার প্রথাও চালু করা হয়। এইভাবে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হলো।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পরও এই ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। বরং শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁদের চালচলনে অন্যদের চেয়ে নিজেদের বেশি ইসলামী বলে জাহির করতে শুরু করলেন। ঘন ঘন সৌদি আরবে গিয়ে হজ ও ওমরাহ পালন করে তাঁরা জনমনে এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যে তাঁরা তাঁদের বিপক্ষদের তুলনায় অনেক বেশি পরহেজগার মুসলমান। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে তাঁদের এইসব ইসলামী চালচলনের দ্বারা ধর্মভীরু মুসলমান জনসাধারণের মন জয় করবেন এবং প্রতিপক্ষ শক্তিসমূহকে ঘায়েল করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এটা ছিল

ভয়াবহ ভুল ধারণা। প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষ-শক্তির প্রতি তোষণমূলক নীতি অনুসরণ করে তাকে নিষ্ক্রিয় করা যায় না; বরং তার শক্তি আরও বেড়ে যায়। অশিক্ষিত জনগণের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে মূলধন করে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকার নীতিহীন রাজনীতি কখনই শেষ রক্ষা করতে পারে না। বস্তুত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও স্বাধীনতার শত্রু এবং পঁচাত্তরের ষড়যন্ত্রকারীরা চুপচাপ বসে থাকেনি। তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় আওয়ামী লীগ সরকার শক্ত হাতে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারেনি। ক্ষমতায় গিয়ে চরম আত্মবিশ্বাস ও পরম আত্মতুষ্টি তাদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ক্ষমতায় থাকাকালীন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা জনমনে যদি এই বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাতে সক্ষম হতেন যে অন্যদের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি সততা ও যোগ্যতার অধিকারী এবং সমাজ থেকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে অনেক বেশি সক্ষম— তাহলে ২০০১ সালের নির্বাচনে তাদের এ রকম অবিশ্বাস্য ও লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হতো না। নিজেদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার জন্য অন্যদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আত্ম-সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের আত্মশুদ্ধি ঘটাতে হবে; আওয়ামী লীগকে আত্মশক্তি অর্জন করতে হবে।

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলার অগণিত মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই আদর্শ আজ ভূলুণ্ঠিত। যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে যারা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি, যারা চেয়েছিল বাংলাদেশকে আর এক পাকিস্তানে পরিণত করতে, যারা ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কে কলুষিত করেছে— তারাই আজ ক্ষমতাসীন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সরকারের ঘনিষ্ঠ দোসর। গোটা দেশ আজ এই দুর্বৃত্ত গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি। এই ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে ধ্বংস করতে চায়। তারা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উদার মানবতাবাদী বাঙালি সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে চায়। এখন তাদের হিংসাত্মক আক্রমণের টার্গেট বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এবং সকল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, সিলেটের শাহ্জালালের দরগার মতো আধ্যাত্মিক সুফী-দরবেশদের পীঠস্থানও তাদের হিংসাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। বস্তুত এই ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশে তালেবানি শাসন কায়েম করে আমাদেরকে

মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চায়। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে স্বাধীনতার সপক্ষের সকল শক্তিকে এক ও অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মিলিত হয়ে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনও শেষ হয় না; নতুন নতুন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার সংগ্রামকে নতুনভাবে শুরু করতে হয়। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। সুতরাং আওয়ামী লীগকেই স্বাধীনতার সপক্ষীয় শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রতিহত করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে যে কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করতে হবে— এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ঢাকা, ২০০৪

সূত্র নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, কলকাতা ১৩২৯, পৃ. ৪০। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২. Text of Yahya Khan's broadcast 26 March, 1971
দেখুন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, সপ্তম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৪; পৃ. ৩

৩. সম্পাদনা পরিষদ, বাঙালির কণ্ঠ, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৯৯৯, পৃ. ২৮১

৪. Constitution of the People's Republic of Bangladesh, The Bangladesh Gazette Extra-ordinary, published by Authority, Dhaka, December 14, 1972, Part 11. P. 349.

বাঙালির মন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

মুনতাসীর মামুন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্ধারণে বিবিসি'র বাংলা বিভাগ এক শ্রোতাজরিপের আয়োজন করেছিলো। ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল, ২০০৪) শ্রোতাদের ভোটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর আগে আরো ১৯ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। অনেকে আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকবেন শীর্ষে। হ্যাঁ, তিনি প্রায় শীর্ষেই আছেন, দু' নম্বরে। আর তিন নম্বরে আছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এ ফলাফল জামায়াত-বিএনপি সমর্থক ছাড়া সারাদেশের মানুষের মনে প্রবল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছে যার রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে, জিয়াউর রহমানের আমল থেকে এখন পর্যন্ত সরকারের প্রধান চেষ্টা ছিলো মানুষের স্মৃতি ও নতুন প্রজন্মের মন থেকে শেখ মুজিবের নাম অপসৃত করা। সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বদলে জিয়াউর রহমানকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতা এই জরিপকে দেখেছে সত্যের জয় হিসেবে এবং জামায়াত-বিএনপি সমর্থকরা নৈতিক পরাজয় হিসেবে। কিন্তু এই সত্য কেউ অনুধাবন করেননি বা করলেও সামগ্রিক উচ্ছ্বাসে তা চাপা পড়ে গেছে, তা হলো যে, জরিপে বঙ্গবন্ধু শীর্ষে না থাকলে কি একটি দেশের স্রষ্টা হিসেবে তার নাম মুছে যেতো, না কি তিনি শ্রেষ্ঠ থাকতেন না?

বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থায় বিবিসি'র তালিকা আবার অনেককে বিস্মিতও করেছে। জোট-সরকার যৌথভাবে দেশটিকে একটি মৌলবাদী প্রভাবিত অকার্যকর দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে। এবং অস্বীকার করার উপায় নেই এ দেশের ৪০ ভাগ মানুষ এখন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠন প্রক্রিয়া, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ স্বীকার করে না। সুতরাং বাঙালির মন কি এ রকম?

যা বাস্তব তার সঙ্গে এ তালিকা মেলানো যায় না। অবশ্য এ বৈপরীত্য আবার তুলে ধরে বাঙালির মৌলিক চরিত্র যার উল্লেখ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা করেছেন। এবং এটিও প্রমাণ করে বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসি'র জরিপ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন জাগে। তালিকাটি দেখে মনে হয়, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালিরা অংশ নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষের সংখ্যাই বেশি। বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতারা এ ধরনের নির্বাচন করবে তা বিশ্বাস করা কঠিন যেখানে রোল-মডেল জেনারেল জিয়া বা তারেক রহমান বা খালেদা জিয়া। কিন্তু বিবিসি'র জরিপও তো বাস্তব। উল্লেখ্য, প্রবাসী বাঙালিদের একটি পত্রিকা 'পড়শি' এ ধরনের একটি জরিপ চালিয়ে প্রায় একই রকম ফলাফল পেয়েছে এবং সে জরিপ তারা শুরু করেছিলো বিবিসি'র আগে। তাহলে যে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা আমরা বলি তা অবিভাজ্য এবং এতো শক্তিশালী যে, বাঙালির পক্ষে সেখান থেকে সরে আসা মুশকিল। বাঙালি থেকে বাংলাদেশী হওয়াটা কি ক্রান্তিকালীন ব্যাপার মাত্র বা নিছক ব্যক্তিস্বার্থের জন্য? ১৯৪৭-৭১ বাঙালির ইতিহাসের পর্ব বা তার রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বা ঐতিহ্য তা থেকেও বাঙালি কতোটা সরে যেতে পারে?

বিবিসি'র তালিকা বিশ্লেষণ করে বাঙালি মন ও মননের হদিস পাওয়া যেতে পারে। তালিকার বিশজনের মধ্যে তিতুমীরকে ধরলে ৭ জন রাজনীতিবিদ— এরা হলেন, সোহরাওয়ার্দী, জিয়া, ভাসানী, সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক, শেখ মুজিব। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত দু'জন অতীশ দীপংকর ও স্বামী বিবেকানন্দ। বাকি ১১ জন যুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি, মননচর্চার সঙ্গে। এতে প্রমাণিত হয় যে, একটি জাতিকে তুলে ধরে জ্ঞান বা জ্ঞানের চর্চা এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা বিশেষভাবে সমাদৃত বাঙালি মানসে। শুধু তাই নয়, আমরা যা পড়ি বাল্যকালে তা আমাদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। তালিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁদের অধিকাংশের কথা পড়েছি আমরা পাঠ্য বইয়ে। পরে হয়তো ইতিহাসে নাম পেয়েছি। বর্তমানে গণমাধ্যমের কারণেও অনেকের নাম আদৃত। তালিকায় তার প্রতিফলনও দেখেছি।

ষোড়শতম স্থানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নাম অনেককে চমকে দিয়েছে। বাঙালি তাহলে ছোটখাটো এই ধার্মিক মানুষটিকে ভোলেনি? পাঠ্য বইয়ে তার পরিচিতি বহু ভাষাবিদ। কিন্তু তার অন্যতম অবদান মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম। পরম ধার্মিক ড. শহীদুল্লাহ মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছিলেন। টিকি, পৈতা বা টুপি, দাড়ি দেখে নয়। চতুর্দশতম স্থানে আছেন অমর্ত্য সেন। বিশ্বে যখন বাঙালির প্রতিনিধি কেউ নেই তখন অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেলেন, যেনো বাঙালির গর্ব ফিরিয়ে দিলেন। মিডিয়ায় তিনি এবং সত্যজিৎ রায় (ত্রয়োদশ) যেভাবে আলোচিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন তাও মানুষের মনে রেখাপাত করেছে। এবং দুজনই বহির্বিশ্বে বাঙালিও যে কিছু করতে পারে তার প্রমাণ রেখেছেন যা বাঙালির বুক স্ফীত করেছে। দ্বাদশতম স্থানে লালন আসবেন, কেউ কি ভেবেছে? মরমিয়াবাদের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ তাহলে মরে যায়নি। তিতুমীরের বাঁশের

কেল্লার সঙ্গে আমাদের ছোটবেলায়ও পরিচিত হতে হয়েছে। তাঁর মাপের অনেক বাঙালি ছিলেন। কিন্তু আমরা একসময় জেনেছি তিতুমীর সংগ্রামের প্রতীক। রাজা রামমোহন রায় (দশম ও বিদ্যাসাগর অষ্টম) আজীবন হিন্দু ধর্মের কলুষের বিরুদ্ধে লড়েছেন। রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক, যে গদ্যকে বিকশিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এক শতক বাংলার শিশুরা তাঁর বই পড়ে বড়ো হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ঐ সময়ে নারীকে মর্যাদার আসন দিতে তাঁদের চেয়ে বেশি সংগ্রাম আর কেউ করেননি। জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম বাঙালি যিনি বহির্বিশ্বে বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর নামও তালিকায় আসতে পারে কেউ ভাবেননি। তালিকায় একমাত্র মহিলা ষষ্ঠ স্থানে বেগম রোকেয়া যিনি নারীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। এ ভূখণ্ডে বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির প্রতীক। তিনি তালিকায় থাকবেন তা যেনো ছিলো অবধারিত।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা অসম্ভব। সবাই জানতেন তালিকায় তাঁরা থাকবেন, আগে-পিছে। সেই চল্লিশের দশকে নজরুল বাঙালি ও বাংলাদেশের কথা লিখেছেন। তাঁর নামের আগে বিদ্রোহী কবি এই অভিধা না থাকলে যেনো অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যে সব রাজনীতিবিদের কথা এসেছে তাঁদের সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন যারা, তালিকায় যারা আছেন, তাদের চেয়ে কম খ্যাতিমান ছিলেন না। এ মুহূর্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা মনে আসছে (ত্রিশের মধ্যে আছেন)। রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকি সবাই পূর্ববঙ্গের। ফজলুল হক বা শেরে বাংলার স্মৃতি বাংলাদেশের কৃষক-সন্তানদের স্মৃতিতে থাকবেই। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত করেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবলুপ্তের প্রস্তাব করে। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও তার অবদান অসীম। তিনি কতো অসামান্য ছিলেন তা বোঝা যাবে এ বিষয়টি মনে রাখলে যে, বরিশালের এক গন্ডগ্রাম থেকে এসে, মুসলমান সম্প্রদায়ের হয়েও তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বাঙালির ভালোবাসা অন্যরকম, রোমান্টিক, বীর হিসেবে তিনি পূজ্য। গরিবরা মওলানা ভাসানীকে (নবম) ভুলবে কীভাবে? তাঁর নামই তো মজলুম জননেতা। তালিকায় উল্লিখিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে দু'জনকে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। একজন সোহরাওয়ার্দী ও অন্যজন জিয়াউর রহমান। সোহরাওয়ার্দী বাঙালি নন যদিও একসময় আলাদা বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু তাঁকে গুরু মানতেন, সে জন্যেই হয়তো অনেকের ধারণা তিনি বাঙালি। জেনারেল জিয়া যখন বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন তখন নিজেকে বাঙালি বলতেন, বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার পর নিজেকে বাংলাদেশী হিসেবে

চিহ্নিত করেন। যিনি নিজেকে বাঙালি বলতে লজ্জিত হতেন তাকে জোর করে বিবিসি তালিকায় কেন আনালো সেটি একটি প্রশ্ন থেকে যাবে। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র তার আমল থেকে শুরু এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে হয় তাঁর আবির্ভাব। তাই গত তিন দশকে যারা বড়ো হয়েছেন তাদের কাছে জিয়াউর রহমান সেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন বা হয়তো তার নাম তালিকায় আনার জন্য অর্গানাইজড ভোটিং হয়েছে। কে জানে?

তালিকায় যাদের নাম এসেছে তাদের জীবন বিশ্লেষণ করলে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। হয়তো এটিই বাঙালিত্বের নির্যাস। সেগুলো হলো :

১. এরা প্রায় সবাই মনেপ্রাণে জীবনযাপনে ছিলেন বাঙালি।

২. তারা বাংলা ভাষায় আজীবন শুধু চর্চা করেননি, এর প্রসারে কাজও করেছেন এবং বিজাতীয় ভাষা চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মৃত্যুবরণও করেছেন। যে জন্য পঞ্চদশ স্থানে নাম এসেছে যৌথভাবে ভাষা শহীদদের যা অভূতপূর্ব।

৩. এদের প্রত্যেকে বিদ্যমান সমাজ, ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

৪. এরা প্রায় সবাই নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। নিয়ত তাদের কথা মনে রেখেছেন।

৫. এরা কেউ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বরং ধর্মের কলুষ, বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ বা অতীশ দীপংকর ধর্মের প্রচারক ছিলেন, কিন্তু মানবতার কথা বলেছেন। জিয়াউর রহমান ছাড়া এরা কেউ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেননি। এবং আশ্চর্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে কোনো মুসলমান ধর্মগুরু ভোট পাননি, পেয়েছেন মরমিয়া সাধক লালন।

৬. এদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন করতে চেয়েছেন এবং ধর্মের আগে মানুষকে বিচার করেছেন।

৭. এরা সবাই ছিলেন সাহসী।

৮. এদের অধিকাংশ যুক্ত ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে। এদের অধিকাংশ পূর্ব বঙ্গের কিন্তু জীবন ও কর্মের শুরু অবিভক্ত বাংলায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গে। এটি বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা তুলে ধরে। এবং আরো তুলে ধরে বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং লালন করে।

৯. এদের অধিকাংশ বাঙালির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য যাদের আছে বাঙালি তাদের ভালোবাসে,

তাদেরই মনে রাখে। অবশ্যই এ কথাও বলা চলে বাঙালি মৃতদেরই শ্রদ্ধা করে বেশি। জীবিত থাকাকালীন এদের অধিকাংশই পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। তবে বাঙালির মনে তিনিই আসন গেড়ে আছেন যিনি সাহসী, লক্ষ্যে স্থির, মানবতাবাদী, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। এখন প্রশ্ন, সে বাঙালি কেন আজ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সহ্য করছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, বঙ্গবন্ধুকে পদদলন বা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ? তবে তার চেয়েও বড় সত্যি সমগ্র বাঙালি জাতি (বিশ্বের কতোগুলো মৌলিক গুণাবলী শ্রদ্ধাও করছে। তাদের রক্তে জেনারেশনের পর জেনারেশন সেই ইতিহাস-ঐতিহ্য খেলা করছে, এমনকি বিএনপি-জামায়াত করলেও মাঝে মাঝে হয়তো সেই দোলা সে অনুভব করে।

আগেও বলেছি, আজো বলছি, বর্তমানে জোট ও জোট সমর্থকদের মনে হতে পারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে 'অপরাধ' করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে যতো হেনস্থা করা দরকার করতে পারে। এ প্রজন্ম জানে না, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রথম সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আপনাকে দেখেছি।' হাসনান হেইকেল লিখেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক।' বাঙালি জাতির একটা বড়ো অংশ শুধু তাই-ই মনে করে না, এ জন্য সে গর্বিত এবং ভবিষ্যতেও গর্ববোধ করবে। আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জাতীয় কবি নন, তাঁর জাতীয় সঙ্গীত আজ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় না এবং বাংলা ভাষাকে দমনের জন্য অনেকেই প্রস্তুত। কিন্তু বাঙালি, শুধু বাঙালি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক দু'জন বাঙালির নাম জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলা ভাষার, সংস্কৃতির আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন যাঁর গান শুধু আমাদের জাতীয় সঙ্গীতই নয়, সুখ-দুঃখের সাথী; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। আমাদের দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন ঠিকানা। বিবিসি'র জরিপ সেই শুদ্ধ বাঙালির মনকেই তুলে ধরেছে মাত্র।

স্থির লক্ষ্যের রাজনীতিক শেখ মুজিব

স্বদেশ রায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন খুব দীর্ঘ নয়। সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন তাঁর। এই পঁয়ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন এতই ঘটনাবহুল যাকে একশ বছরের একটি ফ্রেমেও আটকানো যায় না। অর্থাৎ সাধারণ বাতাস শত বছরে যে পথ পরিক্রম করে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের একটি ঝড় সেই পথ অতিক্রম করেছে। আর এজন্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে ঝড়ের গতির রাজনীতিক বলা হয়ে থাকে। ঝড়ের গতির এই রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকে বা তাঁর রাজনীতিকে কখনই তাই একটি নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি সিদ্ধান্ত বা একটি ঘটনাই একটি নিবন্ধকে সহজেই একটি বই-এ পরিণত করে ফেলে। এ জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা অনেকটা অসম্ভব।

পাকিস্তান-পূর্ববর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন যেমন মুসলিম লীগের একজন কর্মীর রাজনৈতিক জীবন তেমনি মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের একজন ছাত্রনেতার জীবন। ওই তিন-চার বছরের রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বড় সাফল্য মুসলিম লীগের তুলনামূলক আধুনিক নেতা ও সুশিক্ষিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা। এছাড়া ছাত্র-নেতা হিসেবে নিজেকে অন্তত পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করা। তবে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন বিকশিত হবার অনুকূল পরিবেশ পায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলার রাজনীতি ঢাকা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার এই রাজনীতিতে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলার নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। আর কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলার মুসলিম নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুকাল আগে থেকে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক অনেকটা পরাজিত হন। তিনি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। একজন সরকারি এটর্নী-জেনারেল

হিসেবে নিজেকে সাময়িকভাবে গুটিয়ে নেন শেরে বাংলা। অন্যদিকে কোলকাতা-কেন্দ্রিক যে মুসলমানের নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওই মুসলিমরা ভারত ও পাকিস্তানে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার রক্তাক্ত পরিণতির শিকার হন। ধর্মীয় সম্প্রদায়গত দাঙ্গার মধ্যে তারা হয়ে পড়ে অসহায়। নিজের মানুষগুলোকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে শুধু পাকিস্তানের নামে পূর্ব বাংলায় বা পাকিস্তানে চলে আসাকে নৈতিকভাবে মেনে নেননি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তিনিও মুসলিম লীগের কট্টর রাজনীতির কাছে অনেকখানি পরাজিত হয়েছিলেন। শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীকে এমনি রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করে জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা পূর্ব বাংলার রাজনীতি তুলে দেন নবাব পরিবারের হাতে। খাজা নাজিমউদ্দিন হন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের নেতা। অন্যদিকে মুসলিম লীগের অপর নেতা থাকেন মৌলানা আকরাম খাঁ। তিনি শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ হলেও সংগঠনকে করে ফেলেন কুক্ষিগত। অন্যদিকে তাঁর শিকড় তখনও কোলকাতায়।

খাজা নাজিমউদ্দিন ও মৌলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ মুসলিম লীগের নেতা হবার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ তার প্রাণশক্তি হারায়। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের প্রাণ শক্তি ছিলো গ্রামের দরিদ্র কৃষক মুসলমান। এই দরিদ্র কৃষক মুসলমানরাই ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির মূল শক্তি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার শতকরা যে ছিয়ানব্বইজন মুসলিম পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এদের শতকরা পঁচানব্বইজনের বেশি হবে দরিদ্র কৃষক। শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে অনেকখানি ছিটকে পড়াতে এই পঁচানব্বইজনের থেকেও দূরে সরে যায় মুসলিম লীগ। যার প্রমাণ ইতিহাসে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে পাওয়া যায়। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে প্রমাণিত হলেও এর সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই। তাই দেখা যায় ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলায় দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে। **এক.** পূর্ব বাংলার মানুষের কোন জনপ্রিয় জাতীয় নেতা থাকে না। **দুই.** মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময়ে তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আসেন। যদিও তিনি ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঢাকা-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে আসতে পারেননি। কোলকাতা থেকে তিনিও কয়েক মাস পরে এসেছিলেন। মূলত তাঁর ঢাকা-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে প্রবলভাবে উপস্থিতি ১৯৪৮ সাল থেকে।

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে উপস্থিত হবার আগেই পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে যায়। **এক.** এর একটি অংশ ছিলো ভাষার প্রশ্নে শিক্ষক ও ছাত্রদের অবস্থান নেয়া; **দুই.** কমিউনিস্টদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় বাম রাজনৈতিক-চিন্তামনস্ক কিছু তরুণের উদ্যোগে যুব

সম্মেলন করা। এঁরাই পরবর্তীকালে যুবলীগ গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান যে সময় ঢাকায় আসেন ওই সময়ে যুবলীগ গঠন ও বাংলা ভাষার প্রশ্নে ওই তরুণরা বিশেষ করে, অলি আহাদ, তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ, নঈমউদ্দিন আহমদ অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আবার ভাষার প্রশ্নে তখন কট্টর ডানপন্থী তমুদ্দুন মজলিস নেতা আবুল কাসেমরাও এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারপরেও সমস্ত বিষয়টি ছিলো ছাত্র ও শিক্ষিত তরুণদের ভিতর সীমাবদ্ধ। পাকিস্তান সরকার এই ভাষার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের কারসাজি বা ভারতীয় হিন্দুদের কারসাজি হিসেবেই তুলে ধরেছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে আসার পরেই এই তরুণদের নেতৃত্বে চলে আসেন খুব সহজে। দেখা যায় ঢাকার তরুণ নেতারা অনেকেই তাকে নেতা মানতে শুরু করেছেন।

এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দুটি বিষয় উপলব্ধি করেন। এক, অবিলম্বে পূর্ব বাংলার ছাত্রদের জন্যে একটি গণমুখী সংগঠন দরকার। তাই তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের বদলে পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ গড়ে তোলেন। দুই, ভাষা আন্দোলনকে ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের গণ্ডির বাইরে এনে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত করতে চান। এ সময়ে গণপরিষদে খাজা নাজিমউদ্দিনসহ মুসলিম লীগের নেতারা বাংলা ভাষার বিপক্ষে অবস্থান নিলে এবং ভাষা আন্দোলনকে হিন্দুদের কারসাজি বললে ভাষা সংগ্রাম কমিটি ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতাল পালনে শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখেন। এবং ১১ তারিখ সকালে হরতালের পিকেটিংয়ে তিনি এমন কঠোর অবস্থানে যান যে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ঐ দিন শেখ মুজিবসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের এবং পূর্ব বাংলার তরুণ নেতাদের অন্যতম নেতায় পরিণত হন। এই হরতালের পরে সরকার ও ভাষা সংগ্রাম কমিটির ভিতর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটা শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের জেলখানায় দেখিয়ে নিয়ে আসতে হয়। তাঁর সম্মতি পাবার পরেই এ চুক্তি হয়। এবং বিপুল সংবর্ধনার ভিতর দিয়ে শেখ মুজিব মুক্তি পান।

ভাষা আন্দোলনের এই পর্ব যেমন সরকারিভাবে ভাষার দাবি যে ন্যায্য দাবি এটার স্বীকৃতি পায়, তেমনি পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে একটি নতুন মোড় নেয়। যাদের দূরদৃষ্টি ছিলো তারা বুঝতে পারে যে পূর্ব বাংলার রাজনীতি একটি নতুন পথে যাচ্ছে। সে পথ আর যাই হোক কোন ধর্মীয় অন্ধকারের ভিতর থাকবে না। অবাস্তব কিছু হবে না। শেখ মুজিব ওইভাবে কোন আত্মজীবনী রেখে যাননি। তবে তার রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে সেদিন যে-কজন রাজনীতিক রাজনীতির এই নতুন দিগন্ত দেখতে পেয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তাদের

একজন। তিনি এটা উপলব্ধি করেন ওই সময়ে সব থেকে বেশি প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক সংগঠন। কারণ ছাত্রসংগঠনের আন্দোলনে এক বা একাধিক বিজয় আনা যায়, কিন্তু সেটা ধরে রাখা ও রাজনৈতিক বিজয়ে পরিণত করা যায় না। এ কারণে ১৯৪৮ সালের পরে যে ক'জন রাজনীতিক একটি তুলনামূলক উদার রাজনৈতিক সংগঠন এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অন্যতম। এ সময়ে ওই উদার রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার মতো উদার জাতীয় নেতার অভাব দেখা দেয় পূর্ব বাংলায়। কারণ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনও ভারতে, শেরেবাংলা নিশ্চুপ। তাছাড়া শেরেবাংলার একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিলো সব সময়ই। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যারা ওই সময়ে সামনের কাতারে এসেছে এদের কারোরই বয়স পঁচিশ পার হয়নি। এ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগ নেন আসাম থেকে মওলানা ভাসানীকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসার জন্যে। টাঙ্গাইল থেকে নদী পথে তাঁকে আনানোর ব্যবস্থা করেন শেখ মুজিব। একদিকে যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন কোন জাতীয় প্রবীণ নেতার মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন শেখ মুজিব তেমনি তিনি, কিন্তু ১৯৪৮-এর পর থেকে একদিনের জন্যে কোন আন্দোলন থেকে দূরে থাকেননি। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার দাবিতে আন্দোলন হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ওই আন্দোলনের সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ান। এই আন্দোলনের সামনের কাতারে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান শেষ অবধি মাথা উঁচু করে থাকেন। কারণ, এই আন্দোলনের নেতাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হয়। সে সময়ে জনপ্রিয় নেতা নঈমউদ্দিন আহমদ থেকে শুরু করে অনেকে মুচলেকা দিয়ে নিজের ছাত্রত্ব টিকিয়ে রাখেন। শেখ মুজিব সেদিন মুচলেকা দেননি। যার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাস থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনায় শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি ঘটে ঠিকই। কিন্তু দৃঢ়চেতা রাজনীতিক হিসেবে তিনি আরো সামনে চলে আসেন। তখন থেকেই পাকিস্তান সরকার এই তরুণ নেতাকে একের পর এক নানান অজুহাতে গ্রেফতার করতে থাকে। যার ফলে তিনি মওলানা ভাসানীকে আনালেও ভাসানীর নেতৃত্বে যে সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন তুলনামূলক উদার রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়, ওই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে। তবে ওই সময়ে জেলখানায় বন্দী তরুণ শেখ মুজিবকে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক নম্বর যুগ্ম-সচিব করা হয়।

নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিলো তার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ দ্রুতই পূর্ব বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, আওয়ামী মুসলিম

লীগ গড়ে তোলার আগে শেখ মুজিবুর রহমান কমিউনিস্ট আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি ব্রিটেনে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হবার জন্যে। এ বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত কোন তথ্য মেলে না। তবে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন ও রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে ঠিক যেভাবে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন হতো বা পার্টি পরিচালিত হতো ওই ধরনের রাজনীতিতে শেখ মুজিবের খুব একটা বিশ্বাস ছিলো না। তিনি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তাছাড়া তিনি সময়ের সঙ্গে মিল রেখে, মানুষের চেতনা ও চিন্তার সঙ্গে মিল রেখে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি পছন্দ করতেন। যেটা তিনি বারবার ভাষণে বলতেন, আমি লেফটও নই, রাইটও নই। আমার রাজনীতি হলো লেফট-রাইট-ফরোয়ার্ড। তবে গণতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি জনগণতান্ত্রিক বা বাম গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার পৌঁছানো যে শেখ মুজিবুর রহমানের চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিলো সেটা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন ও কাজ থেকে স্পষ্ট হয়। 'বাকশাল' তার চূড়ান্ত উদাহরণ। ইতিহাস প্রমাণ করবে এটা শেখ মুজিব কোন চাপের থেকে করেননি। তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকেই করেছিলেন।

তবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির একটা বিরাট মিল ছিলো। এমনকি এক্ষেত্রে তিনি এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেমন সংগঠনে বিশ্বাস করে, শেখ মুজিবুর রহমানও তেমনি সব সময়ই শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে বিশ্বাস করতেন। তাই দেখা যায়, আওয়ামী মুসলিম লীগকে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে শেখ মুজিবুর রহমান অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসের ভিতর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এলাকায় প্রায় দেড়শ' জনসভা করেন। এমনিভাবে শেখ মুজিবুর রহমান গোটা ষাটের দশকে যখনই জেলের বাইরে ছিলেন তখনই তিনি সংগঠনের জন্যে তার সব শক্তি ব্যয় করেন। ওই সময়ে শেখ মুজিবের সংগঠন গড়ে তোলার ইতিহাস সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলাদেশের রাজনীতি ও স্বাধীনতা অর্জনকে বুঝতে হলে এটা নিয়ে গবেষণা করা দরকার।

আওয়ামী মুসলিম লীগকে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করার সব থেকে বড় ভূমিকা শেখ মুজিবুর রহমানের। সংগঠন এভাবে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হবার কারণেই দলের ভিতরের উদারপন্থীদের অনেক সুবিধা হয়। তারা সহজেই দলকে একটি অসাম্প্রদায়িক দলে রূপ দিতে পারে। আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগে পরিণত করে। দলটি গণমানুষের দলে পরিণত না হলে এটা সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক বা খেটে-খাওয়া মানুষ সব সময়ই অসাম্প্রদায়িক। তাই যখনই দলে তাদের সংখ্যা বেশি হয়েছে তখনই সম্ভব হয়েছে

দলকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করা। এ কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূল ভূমিকা পালন করে গেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সফলও হন। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেবার প্রস্তাব করেন। ওই প্রস্তাব যাতে দলের কাউন্সিল গ্রহণ করে তাতেও তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। আজ ইতিহাসের বিচারে বসে বলা যায়, ১৯৫৫ সালের এই সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখেই কিন্তু পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো একটি সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে। ওই চেতনার সব থেকে বড় সমর্থক ছিলো পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের শতকরা ছিয়ানব্বইজন সেদিন মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী দলটিকে সমর্থন করেছিলো। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার এই শতকরা ছিয়ানব্বইজন মানুষ ছিলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভিত্তি। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বের আওয়ামী মুসলিম লীগ যে মুহূর্তে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগে পরিণত হয় ওই সময়ে পূর্ব বাংলার সব থেকে জনসমর্থিত দল এই আওয়ামী লীগ। অর্থাৎ যারা পাকিস্তানের রাজনীতির ভিত্তি ছিলো অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে তারা ততদিনে উদার গণতন্ত্রের পথে চলে এসেছে। তারা পরিবর্তন করেছে তাদের রাজনীতি। মানুষের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অবস্থানে চলে আসা ছিলো সেদিন সব থেকে বড় ঘটনা। এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবে পূর্ব বাংলায় ১৯৫৫ সালে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের চূড়ান্ত রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে যায়। যদিও এর আগে ১৯৫৪ সালে পুর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থনের বিষয়টি রফা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আদর্শিক বিষয়টি চূড়ান্ত হয় ১৯৫৫-তে এসে।

১৯৪৮ সালে তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের চিন্তা করেছিলেন। সেই সংগঠনের রাজনীতিতে তিনি বা তাঁর দল চূড়ান্ত সফল হয় ১৯৫৫-এ এসে। এ সময় থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দাবি যেদিকে ছোটে তার ভিতর ছয়-দফা ও স্বাধিকারে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের দুটি ইউনিট হয় সোহরাওয়ার্দীর আমলে। পাকিস্তানের দুই অংশের নাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রাখার প্রতিবাদ করেন সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন, "স্যার (মাননীয় স্পীকার) আপনি দেখুন, তারা পূর্ব বাংলার নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান রাখতে চাচ্ছে। অথচ আমরা বারবার দাবি করে আসছি, পূর্ব বাংলার নাম 'বাংলা' করা হোক। বাংলা নামের একটি ইতিহাস আছে, একটা ঐতিহ্য আছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৫৫ সালের এই ভাষণের ভিতর দিয়ে

এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর রাজনীতির ভিতর বাংলা-কেন্দ্রিক একটি বিষয় উঁকি দিচ্ছে। এমনিভাবে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ছয়-দফা ঘোষণা করেন— যার ভিত্তিতে ১৯৭০-এর নির্বাচনও বাংলাদেশে হয়। ওই ছয়-দফারও অংকুর কিন্তু ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিবের রাজনীতির ভিতর পাওয়া যায়। ৬-দফায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার আলাদা মিলিশিয়ার কথা বা আলাদা দেশ রক্ষার দাবি জানান। ১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে তিনি করাচীর এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে বলেন, দেশরক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ পূর্ব বাংলার হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে সোহরাওয়ার্দীর অধীনে থেকেও শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার আলাদা দেশরক্ষার কথা ভাবছেন। যা পরবর্তীকালে ছয়-দফায় স্পষ্ট হয়। ছয়-দফা ঘোষণা করার পর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি পরিষ্কার হয়ে গেছে। তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শেখ মুজিবের রাজনীতি এখন পাকিস্তান থেকে বের হয়ে আসার রাজনীতি; কিন্তু ১৯৪৮ থেকে মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অধীনে তাঁর রাজনীতিও যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলেও দেখা যাবে তখনও তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিলো। সে লক্ষ্য বাংলা ও বাঙালি। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের রাজনীতিতে তিনি সে কাজে জয়ী হন। এই বিজয়ের লক্ষ্য তিনি স্থির করেন ১৯৪৮ থেকেই।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধু

বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন

'বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপ্তবাণীর মতো সত্য ভাষণের মর্মকথা যে কোনও গণতন্ত্রকামী জাতীয়তাবাদী মানুষের মনে প্রতিধ্বনিত হবে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অনেক রাষ্ট্রের মতো একটি জাতি রাষ্ট্র তাই জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকার সনদ পালন ও বাস্তবায়ন করতে একক ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতিসংঘের ইংরেজি নাম ইউনাইটেড নেশনস এবং বাংলাদেশ একটি নেশন। এই যে জাতিসংঘে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ, তাতে প্রত্যেকের একটি জাতীয় পরিচিতি বা আইডেনটিটি আছে এবং যে পরিচিতি একটি বিশেষ নামের দ্বারা চিহ্নিত। বর্তমানে জাতীয়তা নয়, নাম নিয়ে বিভ্রান্তি চলছে। কারণ ১৯৭৭ সালে এক অধ্যাদেশ বা ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সিদ্ধ করা হয় সংবিধানে ৬ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাঙালি থেকে বাংলাদেশী করায় অনেকে জাতীয়তাবাদকেও বাংলাদেশী বলছেন যদিও সংবিধানে এর কোনও সমর্থন নেই। সপ্তম সংশোধনীর পর বর্তমান অবস্থায় আমার মতে, আমরা ধর্মবিশ্বাস মুসলমান, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে যার ধর্মমতে স্থির, নাগরিকত্বে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বাঙালি এই বুঝতে হলে ১৯৭২-এর সংশোধিত ও সংশোধনের পর বর্তমান বিধানাবলী পর্যালোচনা করতে হবে।

অসংশোধিত সংবিধানে জাতির চারটি আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। প্রস্তাবনীয় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মরিপেক্ষতা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও নাগরিকত্বের পরিচয় বাঙালি বলা হয়। এরপর ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয় ও ২৩শ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের বর্ণনা দেয়া হয়। প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদের আদর্শ, ৯ম অনুচ্ছেদে তার ব্যাখ্যা ও ২৩শ অনুচ্ছেদে সেই জাতীয়তাবাদের উপাদানের বর্ণনা দেয়া হয়। ব্যাখ্যায় ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলা হয়েছে তেমনি জনগণের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ও জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাকে জাতীয় সংস্কৃতি বলা হয়েছে। আমরা এদের মধ্যে একটি যুক্তিসিদ্ধ অবিচ্ছিন্ন যোগ পাচ্ছি। জাতীয়তা কি? ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত

একক সত্তাকে বলা হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আর এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে জনগণের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জড়িয়ে আছে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যাকে ৯ম অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বলা হয়েছে। এই সংবিধান রচিত হয় জেনারেল ওসমানীর প্রস্তাবে।

১৯৭৭ সালে এক্সমেশন অর্ডার জারি করা হলো, যা পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা বৈধ করা হলো। সংশোধন হলে এই রূপ : চার আদর্শের স্থানে ধর্মনিরপেক্ষতা বিলোপ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস প্রবর্তিত হলো, সমাজতন্ত্রের আংশিক সংশোধন করা হয়, আর জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র আদর্শদ্বয় অসংশোধিত থেকে গেছে। কিন্তু নাগরিকত্বের পরিচয় বাঙালির স্থানে বাংলাদেশী করা হয়েছে, ৯ম অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে ২৩শ অনুচ্ছেদ অসংশোধিত আকারে অক্ষুণ্ন আছে। ৯ম অনুচ্ছেদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিলোপ করলেও তার বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। ফলে জাতীয়তাবাদ ও ২৩শ অনুচ্ছেদ রয়ে গেছে। এই শূন্য পদটি অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদ কি নাগরিকত্বের পরিচিতি বাংলাদেশী দিয়ে পূরণ করা যাবে? অনেকে তাই করছেন কিন্তু সেটা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা সবক্ষেত্রে এক নয়, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিটির ঘরে সরাসরি ইউনাইটেড নেশনস অব আমেরিকা লেখা থাকে, আমেরিকান লেখা থাকে না। এই নাগরিকত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশজ অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ও ভৌগোলিক পরিচিতি বহন করে। জাতীয়তা প্রধানত ভাষা সমৃদ্ধি বা অনুরূপ সনদ সম্পদ নিয়ে গঠিত। যেমন আমাদের সংবিধানে সংশোধনের পর ২৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে জাতীয় ভাষা, সাহিত্যে শিল্পকলা যা আমরা সুদূর অতীতকাল থেকেও ঐতিহ্যরূপে পুরুষানুক্রমিকভাবে ধারণ করে আসছি। এই ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে যে গোষ্ঠী চেতনা তাকেই ৯ম অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তা বলা হয়েছে। বর্তমানে ২৩শ অনুচ্ছেদ রয়েছে, আরও রয়েছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ। মাঝখান থেকে বাঙালি জাতীয়তা কথাটা বা নামটা বিলোপ করা হয়েছে। কিন্তু তার বিকল্প কিছু বলা হয় নি। আইনের ব্যাখ্যার নিয়ম অনুযায়ী এই শূন্যতা ব্যাখ্যা দিয়ে পূরণ করতে হবে এবং তা করতে সংশোধনপূর্ব বিধানের উল্লেখ করা আইনসঙ্গত। যুক্তিসঙ্গত কোনো বিকল্প শব্দ বা বিষয় বা বিদ্যমান বিধানাবলীর সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হয় তা যদি না পাওয়া যায় তবে বিলুপ্ত বিধানের প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর ব্যাখ্যার দ্বারা শূন্যতা পূরণ করা যায়। এখানে তাই করতে হবে যেহেতু অসংশোধিত বিধানাবলী পরম্পরায় এই শূন্যতা রয়ে গেছে।

৬ অনুচ্ছেদে 'বাংলাদেশী' শব্দটার উল্লেখ আছে, যাকে ঠিকভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে যে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। সুতরাং বাংলাদেশী এখানে কঠোরভাবে ভৌগোলিক অর্থে সীমাবদ্ধ। এটা আবার আঞ্চলিক দিক থেকেও সীমাবদ্ধ। এর জন্ম ১৯৭৭ সালে।

১৯৭৭-এর পূর্বে বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে ও জাতীয় পরিচয়ে একই শব্দ বাঙালি দ্বারা চিহ্নিত ছিল। সেই দিন থেকে এখন তারা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলে পরিচিত হলো, কিন্তু জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে সুষ্ঠু কিছু বলা হলো না। জাতীয়তা কি বাংলাদেশী হয়ে গেল, হতে হলে তাকে বর্তমান সাংবিধানিক প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদ ও ২৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংস্কৃতির বর্ণনার সঙ্গে সুসঙ্গত হতে হবে। আবার ৯ম অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়েছে, অথচ জাতীয়তার কোনও বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। বাংলাদেশীকে যদি জাতীয় পরিচয়ে আনতে হয় তাকে বাঙালির মতো একটা ভাষা-সংস্কৃতি বা অনুরূপ কোনও ধর্ম-বর্ণ-নারী, পুরুষ নির্বিশেষে জাতীয় সত্তার পরিচয়ে একটা সার্বিক ব্যাখ্যায় আনতে হবে। তা নেই। তার উপর কালের দিক থেকে ১৯৭৭ থেকে বাংলাদেশী বলে আগের পরিচয় পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? আমাদের ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার তো ১৯৭৭ সাল থেকে কারও নির্দেশে শুরু হয় নি। তা ঐতিহাসিকভাবে সুদূর অতীত থেকে বিবর্তিত হয়েছে। জাতীয় ভাষা সাহিত্য ও শিল্পকলা, যা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মূল উপাদান এরও উৎপত্তি তো ১৯৭৭ সাল থেকে হয় নি, এও অতীত কাল থেকে আবর্তিত। সবচেয়ে বড় কথা এই বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা বাঙালি জাতির ১৯৫২ সালের অমর একুশের ভাষা আন্দোলনকে কোথায় ও কীভাবে নির্দিষ্ট করবো?

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যকে পরিষ্কার করা যায়। আজকে জাপানি বা কোরিয়ান যাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি আছে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্যে তারা বাংলাদেশকে নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলাদেশী হতে পারেন। কিন্তু রাতারাতি তাদের ভাষা সংস্কৃতি ভুলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি অবলম্বন কি সম্ভব? আমেরিকায় আজকাল বহু বিদেশীকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে, সেখানে একজন বাঙালি বা ভারতীয় বা চৈনিক প্রভৃতি বিদেশীদের পৃথক সংস্কৃতি স্বীকৃতি দিয়ে নাগরিকত্ব ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা রক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান সংবিধানে যে অবস্থা তাতে আমাদেরও নাগরিকত্ব ও জাতীয় পরিচিতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাকে স্বীকার করে বলতে হবে ধর্মে আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, যে যার ধর্ম নিয়ে আছি, নাগরিকত্বে বাংলাদেশী জাতীয় পরিচয়ে বাঙালি।

আর একটা বিষয় উল্লেখ না করলে কিছু অস্পষ্টতা থেকে যেতে পারে, যাকে নিয়ে 'বাঙালি'–'বাংলাদেশী' বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। সেটা হচ্ছে আমাদের

দেশের লোক যেমন দরিদ্র ও অশিক্ষিত, তেমনি ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু। তাহলে এই জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় কোনও ধর্মীয় উপাদান না থাকলে জনগণের মধ্যে গোষ্ঠীবোধ জাগ্রত হবে কি করে? উত্তর হচ্ছে বিশ্বমানবাধিকার সনদ সঙ্গত বিধানাবলী পালন ও বাস্তবায়ন বা বলবৎ করতে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানবাধিকার সনদে নির্দেশিত ধর্মের বিধানাবলীর উল্লেখ থেকে আমরা পাই সকল নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা। রাষ্ট্র সেখানে নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। সেই দিক থেকে একজন বাঙালি মুসলমান বা হিন্দু ব্যক্তিজীবনে নিষ্ঠাবান মুসলমান বা হিন্দু হতে পারেন এবং তিনি সৃজনশীল শিল্পী হতে পারেন। তার ব্যক্তিগত ধর্ম চেতনা সাহিত্য বা শিল্পে প্রকাশ পাবে। সেটা হবে একজন ব্যক্তি মুসলমান বা ব্যক্তি হিন্দুর জগৎচিন্তা বা জীবনভাবনার পরিশীলিত রূপ। তিনি তা প্রকাশ করবেন ভাষায় অর্থাৎ বাংলায়। শিল্পকলায় যে শৈলী বা আঙ্গিক ব্যবহার করবেন তা হবে প্রথাবদ্ধ কিংবা শৈলী। উদ্ভব করবেন যা হবে একজন বাঙালির যিনি ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান বা হিন্দু। তাঁর সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ বা বাঙালিরা অন্য ধর্মাবলম্বীর হয়েও বুঝতে পারবে, রস গ্রহণ করতে পারবে।

ধর্ম যাই হোক তাকে প্রকাশ করতে হবে হয় ভাষার মধ্য দিয়ে কিংবা প্রথাবদ্ধ একটি শিল্পকলার আঙ্গিক অনুসরণ করে, যার একটা দীর্ঘকালীন ধারাবাহিকতা আছে। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের বৈচিত্র্যময় শিল্পপ্রয়াস বাঙালির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। এইখানে ও এইভাবে ধর্ম সংস্কৃতিতে স্থিত হয়। তবে সংস্কৃতি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নয়। তার স্বাধীন গতি স্বাধীন ধারা আছে।

এইবার শেখ মুজিবের সতর্কবাণীর তাৎপর্য দেখা যাক। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ভোগের ভালোমন্দ নির্ণয় করে কিন্তু কোনও মহৎ উদ্যোগ বা মহান আত্মত্যাগ জাগ্রত করতে প্রয়োজন কোনো মহৎ চেতনা যা স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে। জাতীয়তাবাদী আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই মহৎ চেতনার সৃষ্টি করে। বর্তমান জনজীবনে অর্থ ও অস্ত্রের দৌরাত্ম্য যে আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে এর মোকাবিলা করা যেতে পারে। যারা সন্ত্রাস বা অর্থ নিয়ে দুর্নীতি করে স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে চালিত হয়। জাতীয়তাবোধে ক্ষুদ্র স্বার্থের অবকাশ নেই, বরং জনকল্যাণের জন্যে ব্যক্তিস্বার্থ খর্ব করতে লোক উদ্বুদ্ধ হয়। এইখানে জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব।

ঐতিহাসিকভাবে আমাদের বাঙালি পরিচয় সুদূর অতীতকালে চলে আসছে। লিখিতভাবে প্রায় হাজার বছর পূর্বে আমরা চর্যাপদে পাই 'বঙ্গ' বা 'বঙাল' এর উল্লেখ। এর পূর্বে শব্দটি মুখে মুখে অলিখিতভাবে আরও কয়েকশ' বছর ধরে

আবর্তিত হয়েছে অনুমান করতে পারি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঐতিহাসিকভাবে প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়বঙ্গের নৃপতি। এরপর চৌদ্দ শতাব্দির চার দশকে স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহি থেকে শাহে বাঙ্গন ও শাহে বাঙালিষা বলছেন অর্থাৎ কেবল দেশ বাঙ্গাল নয়, দেশের জনগণ বাঙালি। আবার বাঙালি বলতে ধর্ম বর্ণ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশের জনগণকে বাঙালি বলা হচ্ছে অ-সাম্প্রদায়িক বাঙালি। মোগল যুগ থেকে তো দেশটা সুবা বাঙালা। আবুল ফজল বাঙ্গালা বা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ইংরেজ রাজত্ব বাংলা থেকে সূচিত। ইংরেজ শাসনে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়, যা সূত্রপাত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম। মধ্যযুগে কোনও কোনও সুফী সাধক খোরাসানী, আফগানী, সুলতানীর মতো নিজেদের নামের শেষে বাঙালি ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ যুগে বাঙালি মুসলমান না মুসলমান বাঙালির বিতর্ক হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনপূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরাসরি বাঙালি হিসেবে করেছে। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ইত্তেফাক-সংবাদ-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও'। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বনি উঠেছে 'বাঙালি জাগো'। বাঙালি শব্দ ঐতিহাসিকভাবে বিতর্কিত হয়ে নানা ব্যঞ্জনা বহু সম্ভাবনা কত বাসনা কত কামনা নিয়ে আমাদের জাতীয় সত্তার পরিচয় হয়ে আছে।

ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসেবে যদিও জাতীয়তাবাদের বহু উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান হতে পারে, তবুও ধর্মীয় গোষ্ঠীবোধ আর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাও সৃষ্টি করে ভ্রাতৃত্ব। তবে এটা হলো এক ধর্মবিশ্বাসীদের ভ্রাতৃত্ব। একটা পারলৌকিক ভাববাদী, অপরটা ইহজাগতিক বাস্তববাদী, একটাতে ছোট-বড়ো অসমান সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য বা ডিউটির উপর আর একটি সমান রাজনৈতিক অধিকার বা ইকোয়াল রাইটের উপর প্রাধান্য দেয়। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে যেমন ইসলামে মসজিদ একই কাতারে ধনী-নির্ধনে দাঁড়িয়ে নামায ও ভোজের সময় একই কাতারে বসে ভোজন। কিন্তু ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, জমিদার-কৃষি-প্রজার পার্থক্য ও সে সূত্রে সামাজিক ব্যবধান দুস্তর। এছাড়া একই রাষ্ট্রে যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী থাকে, তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধানে কেবল দুস্তর নয়, সম্পর্ক বৈরী ভাবাপন্ন মানসিকতা বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট। যেমন— হিন্দু-মুসলমান, মুসলমান যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় হিন্দুদের থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে অর্থাৎ 'ইকোয়াল রাইট' হতে বঞ্চিত। আবার জাত পাত বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মে এই ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সংকুচিত, কেবল আপন বর্ণের মধ্যে সীমিত। যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মধ্যে কিংবা মুচি মুচির মধ্যে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-মুচির মধ্যে কোনও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই, আছে হয় বৈষম্যমূলক সহঅবস্থান নয় বৈরিতামূলক সংঘাত। তাই হিন্দুদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ দৃষ্ট হয় তা আপন কাস্ট বা বর্ণের মধ্যে

সীমাবদ্ধ। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আপন ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত। একটাতে সৃষ্টি হয় কাস্ট বা গোত্রবোধ আর একটাতে কম্যুনিটি বা সম্প্রদায়বোধ কমন রিলিফ কোনোটাতে ইকোয়াল রাইটের বোধসম্পন্ন জনগণের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জাতীয়তাবোধ নেই। জাতীয়তাবোধের চাই ইকোয়াল রাইটের অধিকারী জনগণের ভ্রাতৃত্ব। একটি হলো 'কম্যুনিটি' যার ভিত্তি কমন রিলিফ, আর একটি 'ন্যাশনালিটি' যার ভিত্তি 'ইকোয়াল রাইটি'।

ধর্মে আছে কোনো বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসের ভক্তি। জাতীয়তাবাদে আছে দেশপ্রেম বা দেশজ মানুষ নিয়ে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে। ধর্ম বিশ্বাস একই ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে যে গোষ্ঠীবোধের সৃষ্টি করে তা হলো সম্প্রদায়বোধ আর দেশপ্রেম সৃষ্টি করে জাতীয়তাবোধ। একজন ধার্মিক আপন ধর্মের সকল বিধান অনুসরণকারী। একজন জাতীয়তাবাদীর কাছে ধর্ম মুখ্য নয় ব্যক্তিগত ও গৌণ। একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী থাকলে ধর্মবোধ তাদের মধ্যে সহনশীল থাকতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ একমাত্র জাতীয় চেতনা থেকে সৃষ্টি হয়।

ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা গোষ্ঠীবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা দেখলে আমাদের কথাটা স্পষ্ট হয়। সব ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীরা বলে থাকে, ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 'কমপ্লিট কোড অব লাইফ'। সকল মুসলমান একটি জীবনবিধান অনুসরণ করে তাই একই গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে কিন্তু ইসলাম তো একমাত্র ধর্ম নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রত্যেক ধর্মেরই আপন আপন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান আছে। সেই হিসেবে তাদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা দেখা দেবে। তাহলে এক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীচেতনা বা জাতীয় চেতনা কোথায়? এইভাবে ঐক্যবোধ আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান কাম্য করার অর্থ পূর্বনির্ধারিত আচার আচরণ মান্য করা— সেগুলো যুগপোযোগী হোক বা না হোক, জাতীয়তাবাদের মূল বিষয় যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাধীন জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক বা প্লুরাল সমাজ তা সৃষ্টি হয় না। ব্যক্তিস্বাধীনতা রূঢ়ভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ধর্ম তাই জাতীয়তার মূল ভিত হতে পারে না। হয়ও না। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে শেখ মুজিব ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এই সার্বজনীন দিকটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব তিনি সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন আমরা বাঙালি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

তিনি তো শুধু একজন ব্যক্তি নন। একটি প্রতিষ্ঠান। একটি আন্দোলন। একটি বিপ্লব। একটি অভ্যুত্থান। জাতি নির্মাণের কারিগর। মহাকাব্যের অমর গাথা এবং একটি ইতিহাস।

এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি হাজার বছর। তাই সমকাল তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। ভাবীকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেবে মহাকালের মহানায়করূপে।

তিনিও ইতিহাসে অক্ষয় ধ্রুবতারার মতো অম্লান গরিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বাঙালি জাতিকে পথ দেখাবেন। তাঁর স্বপ্ন বাঙালির অস্তিত্ব। তাঁর স্বপ্ন বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি। তাঁর সম্ভাবনা বাঙালি জাতি ও তাঁর সভ্যতার নব অভ্যুদয়।

জনগণের কাছে তিনি বন্ধু। জাতির কাছে তিনি পিতা। বিদেশীদের চোখে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা (Founding Father)। তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ উইক পত্রিকা বলেছে, শেখ মুজিব Poet of Politics রাজনীতির কবি। বিলেতের মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মনীষী লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড় নেতা। নতুন মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল (আল আহরাম, কাগজের সাবেক সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বলেছেন, 'নাসের কেবল মিসরের নন, সারা আরব জাতির মুক্তিদূত। তাঁর আর জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রেরণা। তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, সারা বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। তাঁর বাঙালি

জাতীয়তাবাদ বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়মন্ত্র। মুজিব বাঙালির অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন, আমি হিমালয় পর্বত দেখি নি। শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লেখা শোকবাণীতে বলেন, এটা আপনাদের কাছে অবশ্যই এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি।

আসলে জাতির পিতা বলতে এখানে ন্যাশন স্টেটের প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চেতনার ফসল আধুনিক জাতীয়তা ও জাতীয় রাষ্ট্র। এই আধুনিক ন্যাশন ও ন্যাশন স্টেট প্রতিষ্ঠায় যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, জাতি তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতা ও রাষ্ট্র-নির্মাতার সুউচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এজন্য কামাল আতাতুর্ক নব্যতুরস্কের জনক, মহাত্মা গান্ধী নতুন ভারতের পিতা, শেখ মুজিবুর রহমান মডার্ন ন্যাশন-স্টেটের নির্মাতা এবং বাঙালি জাতির জনক।

কামাল আতাতুর্ক এবং গান্ধীর চেয়েও শেখ মুজিব আরও বেশি সার্থকভাবে জাতির পিতার মর্যাদার অধিকারী। ওসমানিয়া বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের আমলেও তুর্কি জাতির নাম ও অস্তিত্ব বহাল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পর কামাল পাশা সেই সাম্রাজ্যের শেষ ভগ্নবিশেষ তুরস্ককে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক ন্যাশন-স্টেট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীর আগে এবং তাঁর আমলেও ভারত তার নাম এবং ভারতবাসী তাদের জাতিত্বের পরিচয় হারায় নি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশ ও বাঙালি নামটি মুছে দেয়া হয়েছিল।

নতুন পাকিস্তানি শাসকরা তাদের সংবিধানেই বাংলাদেশের নতুন নাম দেন পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হাজার বছরের জাতিত্বের পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের কপালে একমাত্র পরিচয় সেঁটে দেয়া হয় পাকিস্তানি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বলা হয় এবং এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় দেয়াও ছিল দেশদ্রোহিতামূলক দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার এই নব্য উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রথম সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বলেন, স্পিকার মহোদয়, ওরা

(সরকার) পূর্ব বাংলার নাম বদল করে পূর্ব পাকিস্তান রাখতে চায়। আমরা বারংবার দাবি জানাচ্ছি আপনার 'বাংলা' এই নাম ব্যবহার করুন। বাংলা নামের ইতিহাস আছে। আছে নিজস্ব ঐতিহ্য-ট্রাডিশন। এই নাম পরিবর্তন করতে হলে বাংলার জনগণের কাছে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে। তারা এই নাম বদল মানতে রাজি আছে কি না। শেখ মুজিবের এই সুস্পষ্ট প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এবং বাংলাদেশের জনগণের কোনোরকম মতামত না নিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা নাম মুছে দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শেখ মুজিব কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালির কপাল থেকে এই দাসত্বমূলক পরিচয় মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেন। এ বছর ৫ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ঘোষণা করেন, একসময় এদেশ থেকে, এদেশের মানচিত্র থেকে বাংলা কথাটার সর্বশেষ চিহ্নও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও নামটির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তানের বদলে শুধু বাংলাদেশ হবে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের নবজন্মের ক্রান্তিলগ্নের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকেই উচ্চারিত হয়। এটা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির নব অভ্যুদয়েরও ঘোষণা। বাঙালির ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির অবরুদ্ধ স্রোতেরও মুক্তিলাভের ঘোষণা। বাংলাদেশ ও বাঙালি এই দুটি লুপ্ত নামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাঁর হাতে, বাঙালির নিজস্ব দেশ প্রতিষ্ঠা যাঁর দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন ও সংগ্রামের ফল, তাকে বাঙালি জাতির জনক, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা ছাড়া আর কি যোগ্য নামে ডাকা যায়? শেখ মুজিবের বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিপ্লব নয়।

বাঙালির আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ন্যাশন-স্টেট প্রতিষ্ঠার পর তিনি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষিতের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর দঃসাহসী দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এখন অনেকেই স্বীকার করেন, গান্ধী ছিল অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁকে সফলভাবে প্রয়োগ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন শেখ মুজিব। তাঁর রাজনীতি ছিল বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সংগ্রাম, নীলচাষ বিদ্রোহ ও প্রজা আন্দোলনের ধারা, গান্ধীজির সত্যাগ্রহ প্রেরণা, সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসাম্প্রদায়িকতা, শেরেবাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র গঠন করেছে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নেমে তিনি হয়েছেন সমাজবাদী। পশ্চিমা গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তির উপর যে সেক্যুলার গণতন্ত্র তিনি প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন, জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তাঁকে তিনি মুক্ত সমাজবাদী চেতনা ও কর্মসূচির সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেন হয় বাংলাদেশের সকল ধর্মের, সকল অঞ্চলের, সকল মানুষের মিলন-মোহনা, বাংলাভাষা যেন হয় বিশ্বসভায় বাঙালির সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, এই স্বপ্ন-সাধনা দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। তাই জাতিসংঘে দাঁড়িয়েও তিনি সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছেন বাংলার। রবীন্দ্রনাথের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভের পর এটাই বাংলাভাষার আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

এই শতকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও নব্য উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধী, টিটো, নাসের, সুকর্ণ, লুমুম্বা, নক্রুমার নামের পাশাপাশি শেখ মুজিব নামটিও সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি তাঁর স্বপ্ন সাধনা, সংগ্রামের মধ্যেই আত্মাহুতি দিয়েছেন। নিজের বুকের রক্তে নিজের স্বজন-পরিজনদের রক্তে তিনি বাংলার নতুন ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন স্বাধীন বাংলার নতুন প্রজন্মের জন্যে। তিনি আজ বাংলার জাতীয় পতাকার রক্তসূর্য। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু এই দুটি নাম আজ অভিন্ন। বাংলার স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু চিরকালের জন্যে চিরজাগ্রত। তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি তো আবহমান বাংলার চিরকালের প্রাণপ্রবাহ। বাংলার পাখির গানে, নদীর কলতানে, বাতাসের উচ্ছ্বাসে, আকাশের গরিমায়, সূর্যের শৌর্যে, চাঁদের কিরণে, নক্ষত্রের ছায়াপথে, ভোরের শিশিরে, মসজিদের আযানে, মন্দিরের কাঁসরধ্বনিতে, গির্জার ঘন্টায়, জারি সারি ভাটিয়ালির সুরে, বসন্তের উল্লাসে, বর্ষার ক্রন্দনে, শরতের শ্যামলিমায়, বৈশাখের ভৈরবীতে, বাঙালির হাসিকান্না, প্রেম ভালবাসায়, মিলনে বিরহে তিনি চিরদিনের জন্যে, চিরকালের জন্যে জাগ্রত, জীবন্ত। তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি আরও বেশি জীবিত চিরকালের বাঙালির মনে ও মননে।

এই বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনের ছবি ভাষায়, রঙে বা আলোকচিত্রে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কারণ, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'। এই মহত্ত্বের কোনো ছবি তোলা যায় না। একমাত্র জাতীয় চেতনার বিশাল উপলব্ধিতে তাঁর অবস্থান। তবু কেউ ভাষায়, কেউ রঙে, কেউ ছবিতে মহৎ ও মহামানুষের, মহানায়কের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এই অ্যালবামটিও বাংলার মহানায়কের স্মৃতি ধরে রাখার এমন একটি প্রচেষ্টা।

বঙ্গবন্ধু : মানবতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক

আব্দুল হালিম

এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত গুণাবলি অনুধাবন করা এবং জনসমক্ষে তা উপস্থিত করার মতো কোন বুদ্ধিজীবী বা পণ্ডিত আজ পর্যন্ত উদিত হলেন না।

এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, বুদ্ধিজীবীদের উপরোক্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও, বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল এবং এখনও তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে আছে। আরো সুখের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি সত্ত্বেও বাংলার তরুণ সমাজ বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত এ নীতি হলো মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিকতার নীতি। বঙ্গবন্ধুকে যে জনগণ গ্রহণ করে নিয়েছে, বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিকতার এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বস্তুত, বুদ্ধিজীবীরা যখন বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেন, তাতে তাঁদের অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারারই প্রকাশ ঘটে।

আমি প্রায় ঢালাওভাবে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছি বলে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করবেন। কিন্তু কোনও বুদ্ধিজীবী প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুর গুণ ও মাহাত্ম্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা নেই। হয়তো আছেন কিন্তু তেমন ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী সার্বিক হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। অনেকে হয়তো বলবেন, বঙ্গবন্ধুকে প্রশংসা না করলেই কেউ নিন্দনীয় হবেন কেন। আমি মনে করি, বাংলাদেশে বাস করেও যদি কেউ বঙ্গবন্ধুর গুরুত্ব অনুধাবন না করতে পারেন তবে তিনি বুদ্ধিজীবী নামের অযোগ্য এবং দেশপ্রেমিক অভিধারও অযোগ্য। কারণ বঙ্গবন্ধু ছিল বাঙালি জাতির দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক এবং বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশপ্রেমের প্রকৃত উদগাতা। এ কথা যাঁরা না বোঝেন বা স্বীকার না করেন তাঁরা বাঙালি দেশপ্রেমিকের গণ্ডীর বাইরে বলে গণ্য হবেন— আমার দৃষ্টিতে এ অভিমতকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অনেকে বলে থাকেন, বঙ্গবন্ধুকে কেউ অস্বীকার করলেও তাঁর পক্ষে দেশপ্রেমিক হওয়া অসম্ভব নয়। আজকাল আবার বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বা বাদ রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উত্থাপন করা হচ্ছে।

আমার মতে, এ সকল কথা অর্থহীন। বাংলাদেশের সংগ্রামের মূল নায়ক বঙ্গবন্ধুকে বাদ রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উচ্চারণ করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের গণবিরোধী চরিত্র গোপন করার জন্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরণাপন্ন হন। বঙ্গবন্ধুর গুণ অন্বেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের উপর দোষারোপ করায় অনেকে হয়তো বিস্মিত হবেন। অনেকে এও জানতে চাইবেন, বুদ্ধিজীবীদের কোনো অংশই কি বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ছিল না বা বঙ্গবন্ধুর গুণ উপলব্ধি করতে পারেন নি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ রকম কোনো অংশ আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। মৌলবাদীদের কথা বাদ রেখেই বলছি, প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে বাংলাদেশের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মূলত পাকিস্তানী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল, এখনও আছেন; এ ছাড়া বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ বামপন্থী পরিচয় ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছিল। বামপন্থীদের মধ্যে অনেক দল উপদল ছিল, কিন্তু তাদের প্রায় সব দলের মধ্যেই পাকিস্তানী ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করার মধ্যেই এক ধরনের পাকিস্তানী ভাবধারার অস্তিত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুই অবিচলভাবে পাকিস্তানী ভাবধারার বিরোধিতা করেছেন এবং পাকিস্তানী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা চলে যে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী ভাবধারা বিদ্যমান আছে।

পাকিস্তানী ভাবধারা কথাটা শুনলে অনেকেই রাগ করবেন, ভাববেন তাঁদের পাকিস্তানী এজেন্ট বলা হচ্ছে। কিন্তু সে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং এ পাকিস্তানও বর্তমান পাকিস্তান নয়; বাংলাদেশ যখন পূর্ব বাংলা হিসাবে পাকিস্তানের অংশ ছিল (১৯৪৭-৭১) তখন পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী বাঙালির উপর যে বিষাক্ত ভাবধারা চাপিয়ে দিয়েছিল তাকেই আমরা পাকিস্তানী ভাবধারা নামে অভিহিত করেছি। পাকিস্তান আমলের খুব কম বুদ্ধিজীবীই এই বিষাক্ত পাকিস্তানী ভাবধারার প্রভাবের বাইরে থাকতে পেরেছেন। ঐ প্রভাবের রেশ এখনও বজায় আছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে আশা করি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, সমস্ত বুদ্ধিজীবী একযোগে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন। অনেকে বামপন্থী সেজে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় নিমগ্ন হলেন। উগ্র বামপন্থীদের দলগুলো তো বঙ্গবন্ধুর বিরোধী ছিলই, ধীরস্থির হিসাবে পরিচিত বামপন্থী ও আধা বামপন্থী দুটো প্রধান দলও এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছিল। এর কারণ কি? এক কথায় এর কারণ হচ্ছে, পাকিস্তানী ভাবধারার প্রভাব।

পাকিস্তানী ভাবধারার একটা প্রধান দিক হচ্ছে, বিনা শ্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার। পাকিস্তানী আমলে বাঙালিদের উপর অর্থনৈতিক শোষণের জোয়াল চাপিয়ে

দেয়া হয়েছিল একথা বয়স্ক লোকেরা সকলেই জানেন, যদিও এ যুগের তরুণদের কাছে কথাটার অর্থ এত স্পষ্ট নয়। কিন্তু এখনকার প্রবীণ এবং তরুণ সকলের কাছেই যে কথাটা অজানা তা হলো, পাকিস্তানী শাসকরা শিক্ষিত বাঙালির জ্ঞান ও বুদ্ধিগত ভিত্তি এবং নৈতিক ভিত্তিকে যতদূর সম্ভব ধ্বংস করে দিয়েছে। এ কারণেই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বুদ্ধিজীবীরা যখন দেখলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন তখন তাঁরা দল বেঁধে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন। এটাই হলো পাকিস্তানী ভাবধারা। পাকিস্তানী ভাবাদর্শ তাঁদের বলতে শিখিয়েছে 'টাকা কোথা থেকে আসবে জানি না, কিন্তু টাকা আমাদের চাই'। একথা সকলেই বুঝবেন, টাকা আসতে পারে শুধু গরিব কৃষক শ্রমিকদের শোষণ করে। বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে বুঝলেন যে জনগণকে শোষণ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে তুষ্ট করা গণতন্ত্র-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী কাজ।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের বোধ অন্য রকম। তাঁরা গরিবের স্বার্থরক্ষার নাম করে কেউ জাসদের উপদেষ্টা সাজলেন, কেউ অন্য উগ্রপন্থী বামদলগুলোর সঙ্গে জোট পাকালেন। পাকিস্তানী আমলে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের কালে যেসব বামপন্থীরা রাজনীতি ছেড়ে ক্লান্ত নির্বিষ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছিল, তাঁরাও বঙ্গবন্ধুর আমলের পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করে অকস্মাৎ নতুন করে উগ্র বামপন্থী সেজে গোখরা সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়ালেন। স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁদের নিরাশ করেছিল। বঙ্গবন্ধু গরিবের রক্ত শোষণ করে বুদ্ধিজীবীদের আরাম আয়েসে রাখেন নি বলে বুদ্ধিজীবীরা নাখোশ, বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানচর্চা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাকরি আর পদের জন্য কাড়াকাড়িতে নিমগ্ন ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এবং পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও পরিকল্পনা মাফিকই এটা ঘটেছিল। ফলে, দেশ যখন স্বাধীন তখন দেখা গেল, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের হাজার রকম সমস্যার সমাধান করা বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতার গণ্ডীর বাইরে। তখন বাধ্য হয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধানের সমস্ত দায়িত্ব এককভাবে বঙ্গবন্ধুকেই নিজের কাঁধে তুলে নিতে হলো আর বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী সেজে সমস্যা বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

আজকাল কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী মতপ্রকাশ করছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তাঁর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকত। তাঁদের সবিনয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে ঐ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলত কে? যাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের সমস্যার প্রাবল্য দেখে দেশ ত্যাগ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে বা আইএমএফ-এ উচ্চ বেতনে কেরানীর চাকরি নিয়েছিল তাঁরা, নাকি যেসব বুদ্ধিজীবী দেশের দরিদ্র জনগণের রক্ত নিংড়ান টাকায় বিলাস ব্যসনে জীবন কাটিয়ে, ছেলেমেয়েদের আমেরিকায় পাঠিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, তারা? যখন পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী নামধারী ব্যক্তিরা বাংলাদেশের পুনর্গঠনের দায়িত্ব এড়িয়ে বিপ্লবী সেজে

বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন, তখন বঙ্গবন্ধুই তো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। যদি বুদ্ধিজীবীদের উপর দোষারোপ করায় কেউ ক্ষুণ্ন হন, তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করি। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এ কথা সকলেই জানেন। ঐ দুর্ভিক্ষে প্রায় ২৭ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছিল, বঙ্গবন্ধুর সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের প্রাণ রক্ষা করতে পারেন নি। তখন স্নায়ুযুদ্ধের কাল। আমেরিকা তখন বাংলাদেশের উপর রুষ্ট। কিছুটা বিদেশী, কিছুটা দেশী চক্রান্তের ফলস্বরূপ চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল একথাও অজানা নয়। কিন্তু কোনো তরুণ নবীন পণ্ডিত সরকারি টাকায় গবেষণা করে বের করলেন যে ঐ দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল আজ পর্যন্ত কোনো অর্থনীতিবিদ বা গবেষক ঐ অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনীর প্রতিবাদ করেন নি বা তা খণ্ডন করেন নি। ১৯৭২ থেকে এক শ্রেণীর সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশে লিপ্ত ছিল। কোনো সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবী আজ পর্যন্ত তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন নি।

কিছুকাল আগে আহমেদ মুসা'র লেখা 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' নামে একটা বই বের হয়েছে। এ বইয়ে নানা অবান্তর ও কল্পনাশ্রয়ী কথা লেখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে এ দেশের মানুষ যখন ব্রিটিশ শাসনের অবসানেরও দুই যুগ পরে জীবনে প্রথমবারের মতো পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র লাভ করল তখন ঐ পূর্ণ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে কতগুলো তথাকথিত বামপন্থী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলল সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রেণী-সংগ্রাম ইত্যাদির ধুয়া তুলে। যে কোনো সরকারেরই প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দেশকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করা। বঙ্গবন্ধুর সরকার তাই করেছিল। এ কারণে উপরোক্ত গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিজীবী ঐ গ্রন্থের অর্থহীন কিন্তু বিষাক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন কি? ঐ বইয়ের নিতান্ত কল্পকাহিনীকে যেভাবে গবেষণালব্ধ সত্য হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে অনেক সরলমতি পাঠক বিভ্রান্ত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো বুদ্ধিজীবী ঐ গ্রন্থের বক্তব্যকে খণ্ডন না করায় ঐ বইখানির বক্তব্য সত্যের মর্যাদা লাভ করে চলেছে।

আহমেদ মুসার লেখা ঐ গ্রন্থের গবেষণা পদ্ধতির একটা নমুনা দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করব। সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সিরাজ শিকদার বঙ্গবন্ধুর আমলে গোপন আন্দোলন পরিচালনায় লিপ্ত থাকা কালে ধরা পড়েছিল এবং তারপর অজ্ঞাত কারণে ও রহস্যাবৃত পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছিল। সিরাজ শিকদারের রাজনৈতিক মতবাদ বা তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা না করেও এ কথা বলা চলে যে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না এবং গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে ঐ রকম মৃত্যু সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর জন্য সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করা হয় যদিও এ রকম অভিযোগের

কোনো প্রমাণ নেই এবং আমি যতদূর জানতে পেরেছি, কথাটা সত্যও নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিজীবী সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর জন্য বঙ্গবন্ধুকে যে অযৌক্তিকভাবে দায়ী করা হয় তার বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। এর অর্থ হলো, বঙ্গবন্ধু যে সত্যিকার গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী এবং প্রকৃতিগত ভাবেই কোনো রকম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিল এ কথা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নিকট আজও অজানা রয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর মাহাত্ম উপলব্ধি করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তাঁরা নিজেরাই এখন পর্যন্ত পাকিস্তানী ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন।

সিরাজ শিকদারের মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত রচনা বের হয় 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৯ মে, ১৯৭৮)। আহমেদ মুসার বইয়ে বিচিত্রার লেখাটিকেই বলতে গেলে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। সকলেই জানেন, বিচিত্রা পত্রিকাটি সরকারি টাকায় প্রকাশিত হলেও এর পরিচালনার দায়িত্ব বরাবরই বামপন্থী নামে পরিচিত একটি গ্রুপের করায়ত্ত ছিল যাদের কাজই ছিল প্রথমাবধি বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করা। আহমেদ মুসা যেহেতু বেছে বেছে ঐ পত্রিকাটির লেখাকে অবলম্বন করেই সিরাজ শিকদার সংক্রান্ত রচনাকে আপন গ্রন্থভুক্ত করেছেন, আমরা ধরে নেব এ রচনাটি কার্যত তাঁরই গবেষণালব্ধ ফল। এক কথায়, আহমেদ মুসার গ্রন্থে প্রকাশিত যাবতীয় কাহিনী এবং সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর বিবরণ সম্পর্কিত কল্পকাহিনী রচনার অথবা প্রকাশ করার দায়িত্ব আমরা তাঁর উপরই অর্পণ করব, যেহেতু তিনি এগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন এবং এ সকল বিবরণের সঙ্গে একাত্মতা ও ঐকমত্যও প্রকাশ করেছেন।

আহমেদ মুসার গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং বিকৃত সিরাজ শিকদারের মৃত্যু সম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণে কল্পনা এবং মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নেই। এই বিবরণে 'একজন নির্ভরযোগ্য' ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছিল। আহমেদ মুসা সরলমতি পাঠককে বিশ্বাস করতে বলেছেন যে তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কথাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন, যদিও ঐ রকম ব্যক্তির আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানাও পাঠকের পক্ষে, এমন কি আহমেদ মুসার পক্ষেও সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিজীবী ঐ রচনার বা বিচিত্রায় প্রকাশিত লেখার বক্তব্যকে খণ্ডন করেন নি বা এভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করার বিরোধী ছিল।

সিরাজ শিকদারের মৃত্যু ঢাকায় ঘটেছিল এবং আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা ঢাকাতেই থাকেন। একটু অনুসন্ধান করলে সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে সত্যি কথাটা জানা যেত না, এটা সম্ভব নয়। কিন্তু এ দায়িত্বটুকু তাঁরা পালন করেন নি। এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে যা জানতে পেরেছিলাম এখানে তাই পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বামপন্থী নেতা, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের নেতা আলী আকসাদ আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছেন যা থেকে আমি জানতে পেরেছি যে বঙ্গবন্ধু সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী তো ননই, বরং তাঁর মৃত্যু সংবাদে রীতিমতো বিচলিত হয়েছিলো। ঘটনাটা এই : একদিন আলী আকসাদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, তাঁরা দুজনে একটা বড়হল ঘরে বসে কথা বলছেন। এমন সময় তিন-চারজন সরকারি কর্মচারী এ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং বললেন যে একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চান। আলী আকসাদ তখন উঠে আসার উপক্রম করলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁকে সোফায় বসতে বলে নিজে এ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে তাঁদের সাথে অনুচ্চ স্বরে কথা বলতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কি কথা হলো তা আলী আকসাদ জানেন না কিন্তু তিনি দেখলেন যে একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বলছেন : 'কি সর্বনাশ, এটা কি করে হলো?' তারপর একটু থেমে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'খবরদার, তোহার কিছু হয়েছে এ কথা যেন না শুনি।' আলী আকসাদ আমাকে বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো হুবহু এ রকম না হয়ে অন্য রকমও হয়ে থাকতে পারে কিন্তু মূল কথাটা ঐ ধরনেরই ছিল। আলী আকসাদ এসব কথার অর্থ তখন বুঝতে পারেন নি। পরে যখন সিরাজ শিকদারের মৃত্যু সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তখন আলী আকসাদ অনুমান করলেন যে ঐ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুকে সিরাজ শিকদারের মৃত্যুসংবাদ জানাতেই এসেছিল এবং বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া আলী আকসাদ দেখেছিলো তা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর সংবাদ বঙ্গবন্ধুকে স্তম্ভিত, ব্যথিত এবং বিচলিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর উদার হৃদয় এবং মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা সহজেই বুঝবেন যে আলী আকসাদের ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিল। তা ছাড়া, মোহাম্মদ তোয়াহার পরবর্তী জীবনকালের ঘটনা থেকেও আলী আকসাদের বক্তব্যের সত্যতার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিরাজ শিকদারের অস্বাভাবিক ও রহস্যাবৃত মৃত্যুকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের কাজে ব্যবহারের জন্য রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা আরো একটা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। যেমন, জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ভাষণ দান কালে বঙ্গবন্ধু বলেছিল, 'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার', এই একটা বাক্যকে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে (দ্র. বিচিত্রা, ১৯ মে, ১৯৭৮, পৃ. ১৭) প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঐ কথাটি ছিল গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন এবং শর্তহীন আনুগত্যের অঙ্গীকার এবং তাঁর আমলে সংঘটিত যে কোনও বেআইনী বা অগণতান্ত্রিক ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার মতো দায়িত্ববোধ প্রকাশ। এ রকম দায়িত্ববোধের পরিচয় পাকিস্তান আমলে বা স্বাধীন বাংলাদেশে অন্য কোনও রাষ্ট্রনায়ক প্রদান করেছেন বলে আমার জানা নেই।

বঙ্গবন্ধু বলেছিল, 'কোথা আজ সিরাজ শিকদার', উগ্রপন্থী সমালোচনা এ কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ প্রচার করে থাকেন যে বঙ্গবন্ধু সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে দেশবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। এটা সঠিক ব্যাখ্যা নয়, অপব্যাখ্যা মাত্র। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল; পূর্ণ গণতন্ত্র প্রদান করা সত্ত্বেও অনেক উগ্রপন্থী দল অস্ত্র জোগাড় করে রাতের অন্ধকারে নরহত্যা করে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার কথা প্রচার করে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলো যে এটা গণতন্ত্রের পথ নয়। এ প্রসঙ্গেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলো; 'কোথায় সিরাজ শিকদার'! (দ্রঃ দৈনিক সংবাদ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫) অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে দেশবাসী সিরাজ শিকদারের রাজনৈতিক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্ত্রের বলে ক্ষমতা দখলের অমানবিক পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

'কোথায় সিরাজ শিকদার'— এ উক্তির মধ্যে একটা ব্যথার সুরও ছিল বলে আমার মনে হয়। বঙ্গবন্ধু-বিরোধী শক্তিগুলো প্রচার করে থাকে যে তাঁর ঐ উক্তির মধ্যে একটি শক্তির গর্ব এবং দম্ভের প্রকাশ ঘটেছিল। আমার মতে, তাঁদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। সিরাজ শিকদার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল বটে কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দাবি করে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই এটার মোকাবেলা করতে হবে। এ অবস্থায়, অস্বাভাবিকভাবে এবং রহস্যাবৃত পরিস্থিতিতে যে সিরাজ শিকদারের মৃত্যু ঘটল এ প্রশাসনিক ব্যর্থতার সমগ্র দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েই বঙ্গবন্ধু বলেছিলো–কোথায় সিরাজ শিকদার!' আর বঙ্গবন্ধুর এ আক্ষেপোক্তির মধ্যে এ ভাবটাও প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত ছিল যে কেউ অগণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করলে গণতান্ত্রিক সরকারও সব সময় তাঁর জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা নিতে পারে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু-বিরোধী ব্যক্তিগণ ও দলগুলো এত গভীর বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর না হয়ে সংক্ষেপে অপপ্রচার করে যে বঙ্গবন্ধু সিরাজ শিকদারের মৃত্যুকে অনুমোদন দান করেছিল। এটা যে সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা উপরে আমরা সে কথাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে আজ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী সিরাজ শিকদার প্রসঙ্গে যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয় তা খণ্ডন করার বা বিষয়টাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি।

বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যদিও আমি জানি যে উগ্রপন্থীরা এ দৃষ্টান্তটির অপব্যবহার করতে পারেন। তবু আমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনও কথা গোপন করতে চাই না, যেহেতু আমি জানি যে বঙ্গবন্ধু প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ জনগণের স্বার্থেই গ্রহণ করতেন। ঘটনাটি এ রকম : প্রয়াত রাজনীতিবিদ সবুর খান তখন দালাল আইনে জেলখানায় আটক ছিল। একদিন তিনি কোনো ভাবে জেলখানা থেকে একটা চিঠি পাঠালেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। চিঠির মূল কথা ছিল : 'আমার বয়স হয়েছে, বুড়ো বয়সে জেলখানায় থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে। যদি মুক্তি

পাই, ভালো হয়। কথা দিচ্ছি আর কখনও তোমার বিরুদ্ধে বা দেশের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করব না।' বঙ্গবন্ধু চিঠিটা পেলেন একদিন বিকাল বেলা। তখনই তাঁর সচিবকে ডেকে বললেন, 'কাল সকালের মধ্যে এঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন।' সচিব বললেন, 'নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা করতে কিছু সময় লাগবে।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'নিয়ম রক্ষা পরে করবেন। আমি চাই, কাল সকালের মধ্যেই তিনি যেন ছাড়া পান তার ব্যবস্থা করুন।' সেই রকমই কাজ হলো। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি এ রকম মানবিক আচরণ অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রনায়ক করেছেন বলে আমার জানা নেই। উগ্রপন্থীরা বললেন, বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের মুক্তি দিয়েছেন। তা বলুন। তাঁরা অনেক কিছুই বলেন। যখন জেলে আটক থাকা অবস্থায় ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বাভাবিক কারণে অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তখন, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি দাবি করতেন এমন একজন বামপন্থী সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-কলাম লেখক পত্রিকার পাতায় ফলাও করে লিখলেন যে, জেলখানায় ফজলুল কাদেরের মৃত্যু কেন হলো এ কথার জবাব 'চট্টগ্রাম গেলে' দিতে হবে। এ কথায়, বঙ্গবন্ধুর দোষ খুঁজে বের করার কাজে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিগণ একদিনের জন্যও ক্ষান্তি দেন নি। তবে এটুকু আমরা আশা করব, যে উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক অসুস্থতাজনিত কারণে ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যু ঘটার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করেন তাঁরা অন্তত সবুর খানকে মুক্তি দান করার জন্য বঙ্গবন্ধুর উপর দোষারোপ করবেন না। সেটা একমুখে দু কথা বলা হয়ে যাবে।

সবুর খানের মুক্তির ঘটনাটা উল্লেখ করার বিশেষ কারণ আছে। ঘটনাটা আমি যতদূর জানি, সত্যিই ঘটেছিল। প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্তোষগুপ্ত আমাকে বলেছেন যে, সবুর খান নিজে তাঁকে ঘটনাটার কথা জানিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ধনতান্ত্রিক দেশে, ফ্যাসিবাদী দেশে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের এক এক করে অথবা গণহারে হত্যা করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু অনুতপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার মতো দৃষ্টান্তের সংখ্যা খুব বেশি নেই। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এ উদারতা ছিল। এ কারণেই তিনি বিশ্ব পর্যায়ের স্বল্প সংখ্যক মহৎ হৃদয় রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। সান ইয়াৎ সেন, আব্রাহাম লিংকন বা সালভাদর আলেন্দের মতো উদার হৃদয় গণতন্ত্রমনা ও মানবতাবাদী নেতা ছাড়া মহান হৃদয় বঙ্গবন্ধুর সাথে তুলনীয় অন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা তো এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন না করার দায়ে সমস্ত বুদ্ধিজীবী সমাজকে দায়ী করায় অনেক পাঠকই হয়তো অবাক হবেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে : স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে একটি মাত্র ব্যক্তির পূর্ণ যোগ্যতা ছিল তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে বঙ্গবন্ধুকে প্রয়োজনের সময়ে সমর্থন প্রদান না করা তো স্বদেশদ্রোহিতার শামিল। অথচ সেই বুদ্ধিজীবীরা শুধু অজ্ঞতাকে সম্বল করে

বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন। রাজনীতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই এমন বুদ্ধিজীবীরা শুধু বুদ্ধিজীবী মহলে প্রশংসা লাভের মোহে মতপ্রকাশ করলেন— বাকশাল করাটা রাজনৈতিকভাবে ভুল হয়েছিল। কেউ বললেন, বাকশাল আসলে একনায়কত্ব ছিল। যে বুদ্ধিজীবীরা জীবনে একটা কাজও নিখুঁতভাবে করতে পারেন নি, তাঁরা মতপ্রকাশ করলেন, বঙ্গবন্ধুর অনেক দোষত্রুটি ছিল, তা সত্ত্বেও...: ইত্যাদি। এ যেন এক ছেলেখেলা। বুদ্ধিজীবী নামের যোগ্য হওয়ার জন্য যে জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা প্রয়োজন সেটা বাদ দিয়ে সস্তা রাজনৈতিক মতপ্রকাশকেই তাঁরা নিজেদের করণীয় বলে মনে করলেন। বাকশাল গঠন করাটা ভুল হয়েছিল না ঠিক হয়েছিল সেটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে এবং এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু বাকশাল গঠন দ্বারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা যে বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি ও বঙ্গবন্ধুর মানসগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্গবন্ধু যদি স্বৈরাচারী হতে চাইতেন তা হলে তা আওয়ামী লীগকে অবলম্বন করেই তা হতে পারতেন। তাছাড়া বাকশাল গঠন করা হয়েছিল সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও শক্তিকে একত্রিত করে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে, জাতীয় ভিত্তিতে নতুন বাকশাল দল গঠন করা হয়েছিল। অবশ্য আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য যেসব দল ও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বাকশালে যোগদান করেছিল তাঁরা পরবর্তীকালে বলেছিল যে তাঁদের জোর করে বাকশালে নেয়া হয়েছিল। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এ ক্ষেত্রে আমরা আসলে পাকিস্তানী ভাবধারারই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। যেসব প্রগতিশীল দল ও ব্যক্তি ১৯৭৩-এর শুরু বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিল তাঁরা ১৯৭৫-এ এসে অনেক চেষ্টা-তদবির করে বাকশালে প্রবেশ করেছিল। তাঁদের পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য নয়, ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার লোভেই তাঁরা বাকশালে যোগ দিয়েছিল। এটাই পাকিস্তানী ভাবধারা। পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী ২৪ বছর ধরে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ বিষাক্ত চিন্তাধারা প্রবিষ্ট করেছে যে আত্মস্বার্থ উদ্ধারই একমাত্র বাস্তব সত্য। এই বুদ্ধিজীবীদের নিয়েই বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা তাঁর পক্ষে তেমন দোষাবহ ছিল না। তিনি তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে বিশুদ্ধ মানুষ আমদানি করে দেশগড়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি বুদ্ধিজীবীদের দোষেই বঙ্গবন্ধুর দেশ গড়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আর যদি কোনো ভবিষ্যৎ না থাকে তা হলে এত কথা বলার প্রয়োজনই-বা কি। এর উত্তর হচ্ছে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। বুদ্ধিজীবী ছাড়াও দেশে আরো মানুষ আছে। বঙ্গবন্ধু তো দেশের সাধারণ জনগণের চেতনাকেই উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এ জনগণের চেতনার

মধ্যেই এখন বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা সংরক্ষিত রয়েছে। এই জনগণের নিকট থেকেই আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ও তরুণ সম্প্রদায়কে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া দেশের উন্নতির অন্য কোনও পথ নেই।

অবশ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ অবস্থার জন্য তাঁরা পুরোপুরি দায়ী নন, তাঁরা অবস্থার শিকার মাত্র, পাকিস্তানী ভাবধারার শিকার। এককালে যাঁরা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত ও পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম মানস নিয়ে গবেষণার ভান করেছেন তাঁদের পক্ষে হঠাৎ করে প্রকৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা অর্জন করা এবং জনস্বার্থে আত্মনিয়োগ করা কঠিন বটে। তাঁদের সামনে যে একটা মাত্র পথ খোলা ছিল তা হলো বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদী চেতনা অর্জন করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় নিমগ্ন হলেন। এ কারণেই আমরা বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। বঙ্গবন্ধু বাঙালি বুদ্ধিজীবীর উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিজে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেছেন এবং জনগণকে পাকিস্তানী ভাবধারা থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গবন্ধুর সে বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা রাখেন নি বা রাখতে পারেন নি। এই অর্থে, বাংলাদেশের আজকের দুর্দশার জন্য মূলত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই দায়ী।

বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক চেতনার কথা বলতে গিয়ে বারবার বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা আমরা কেন করছি এ কথাটা পাঠকদের মনে জাগবে, আমরা জানি। এর উত্তর হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী চেতনা কোনো বিমূর্ত বা পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, এবং এ চেতনা শুধু তাঁর মস্তিষ্কেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর প্রধান কীর্তি এই যে তিনি বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করতে পেরেছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনো বাঙালি পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী আজ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর এই হিমালয় সদৃশ সুউচ্চ ও সুবিশাল কীর্তির কথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এমন কি সংক্ষেপে প্রকাশ করেও বলেন নি। অন্যপক্ষে বামপন্থী নামধারী অথবা বামপন্থার ভেকধারী বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক গ্রন্থ রচনা করেন অথবা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে নীরবে অস্বীকার করে বিকৃত ইতিহাস রচনা করেন, তখন অন্যান্য পণ্ডিতরা নিশ্চুপ থেকে অথবা প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়ে ঐ সব ছদ্ম বুদ্ধিজীবীদের সম্মানের আসনে অভিষিক্ত করেন। এখন নামকরা গ্রন্থকাররা এমনভাবে বাংলার ইতিহাস রচনা করেন যেন বঙ্গবন্ধুর কোনো রকম অবদান ছাড়াই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং বাঙালি জাতি নতুন চেতনার অধিকারী হলো। সাধারণ বামপন্থী হোক, উগ্র বামপন্থী হোক, বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় সকলেই একপন্থী হয়ে যান। তাঁরা

এমনভাবে ইতিহাস লেখেন যেন বাহান্ন, বাষট্টি, ঊনসত্তরের গণআন্দোলনই বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের মূল ধাপ। এই সব গণআন্দোলনের ভূমিকা অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু প্রতিটি আন্দোলনের পটভূমিতেই যে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ক্রিয়াশীল ছিল সে কথা তো স্পষ্ট করে বলা হয় না। বামপন্থীরা বলেন, জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা। এতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি জনগণই যে বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে গড়া জনগণ সে কথা তো বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখা পড়ে জানা যায় না।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি মানবতাবাদী কাজকে তাঁর বিরোধীরা বিকৃত আলোকে উপস্থিত করেছেন। সকলেই জানেন, ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে দালাল আইন (Bangladesh Collaborators' (Special Tribuna'1) Order, 1972) প্রণীত হয়েছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ১৯৭২-এ যেসব বাংলাদেশী নাগরিক সহযোগিতা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ আইন প্রণীত হয়েছিল। এ আইন অনুসারে বহু সংখ্যক অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা ঘোষণা করে দালাল আইনে আটককৃতদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না তাদের মুক্তি দানের নির্দেশ দেন।

বঙ্গবন্ধুর এ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছিল এক মহান মানবতাবাদী পদক্ষেপ। এ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে উচ্চধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর সব দেশে তখন এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এর কারণ হলো, পৃথিবীর মানুষ জানে, যেসব দেশে গৃহযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় সেখানে যুদ্ধ শেষে গৃহীত প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের ফলে বহু নিরীহ লোকের প্রাণহানি ঘটে। যদিও দালাল আইনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দালালদেরই বন্দি করা হয়েছিল, তথাপি ঐ দালালদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মাত্রায় অনেক তারতম্য ছিল। এ কারণে জঘন্যতম অপরাধীদের ছাড়া অন্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। এতকাল পরে, অকস্মাৎ স্বঘোষিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অধিকারী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বলতে শুরু করেছেন যে বঙ্গবন্ধু দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়েছিল বলেই আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে। এই যে একটা অনুচ্চার্য অভিযোগ এ কথাটাও সদ্য 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' লাভকারী ঐ সব ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ উত্থাপন করা যে কত বড় গর্হিত অপরাধ এবং ধৃষ্টতার পরিচায়ক তা উপলব্ধি করার মতো বোধশক্তি ঐ ব্যক্তিবর্গের নেই।

এখন দেখা যাবে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রতি ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধ পক্ষের মনোভাব ও অভিমত কি ছিল। 'বাংলাদেশ লিগাল এইড সোসাইটি' নামক

সংগঠনের সম্পাদকের লেখা একটি পত্র ঐ সময়ে (৬.১.৭৪) সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রে অভিযোগ করা হয়েছিল যে নানা অজুহাতে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে দালাল আইনে আটক রাখা হয়েছে এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা একটা প্রহসন মাত্র কারণ অন্য আইনে এ সকল ব্যক্তিকে বন্দি রাখা হয়েছে। হলিডে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করে এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার পক্ষ থেকে পূর্বোক্ত বাংলাদেশী সংগঠনের সম্পাদকের নিকট এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ ফৌজদারি আইনের ৩৬৪ ধারায় (হত্যার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক অপহরণ করা) বর্ণিত অপরাধকে যে সাধারণ ক্ষমতার গণ্ডীর বাইরে রাখা হয়েছে তাকে 'এমনেস্টি' স্বাভাবিক বলেই মনে করে। এ ঘটনাক্রমে থেকে বোঝা যাবে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের যে মানবিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো তাকে নস্যাৎ করার জন্য তখনই অনেকে তৎপর হয়েছিল। আর আজ বাংলাদেশের সচেতন নামধারী ব্যক্তিবর্গ বাঙালির চেতনাকে খর্ব করার জন্য বাঙালিকে মানবতাবর্জিত মানুষে পরিণত করার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার নিন্দায় মুখর হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আদর্শের নামে, প্রতিশোধ গ্রহণের নামে গণহত্যা কম হয় নি। আজ বঙ্গবন্ধুর বিরোধী শক্তি পুনরায় বঙ্গবন্ধুর মানবিক কার্যাবলির সমালোচনা করে জনসাধারণকে হিংসার পথে চালিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এটা যেমন সত্য, তাদের এ প্রয়াসের পটভূমিতে বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী পরিচয়টা আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এ কথাও সমান সত্য।

এ নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সমস্ত মানবিক ও গণতান্ত্রিক গুণাবলির কথা আলোচনা করা সম্ভব হলো না। যে সকল বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিককালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়েছে সে সকল বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টার মধ্যেই মূলত আমাদের বক্তব্য সীমিত রেখেছি। এ অসম্পূর্ণ আলোচনাটি যদি অন্য পাঠকদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে এবং তাঁরা যদি আরো নিখুঁতভাবে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক চেতনার কথা দেশবাসী ও বিশেষ করে এ যুগের তরুণদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে গণ্য করব।

ডিসেম্বর, ১৯৯৩

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি : ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা

অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে ঐ সংগঠনের কিছু সংখ্যক বাংলাভাষী নেতা ও কর্মী ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। কালক্রমে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকালীন পশ্চাদপদ নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করে পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই মূলত সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ আওয়ামী লীগ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উন্মেষ ঘটায়। ফলে পাকিস্তানের শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ শতকে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল বক্তব্য দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আওয়ামী লীগ অন্যতম রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নেতৃবৃন্দ নিহত হন এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে সংবিধানে সন্নিবেশিত অন্যান্য রাষ্ট্রাদর্শের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতারও পরিবর্তন ঘটানো হয়। ফলে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেলে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি চর্চার ক্ষেত্রে ক্রমাগত নতুনতর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সাংগঠনিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই সংগঠনের ঢাকাকেন্দ্রিক নেতাকর্মীরা আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন 'মুসলিম লীগ' গঠন করেন। তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে এটা হয়তো একেবারে বেঠিক নয়। কিন্তু শুধু সাংগঠনিক সমস্যা এবং নেতৃত্বের কলহের কারণেই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়নি।

বরং এই রাজনৈতিক দল গঠনে মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের একাংশের ইতিবাচক ভাবদর্শিক রূপান্তর কাজ করেছিল। ১৯৪০-এর দশকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব রক্ষণশীল ও মোল্লাতান্ত্রিক এবং অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী— এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প পূর্ব থেকে ক্রমাগতভাবে রক্ষণশীল ধারাটি মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ডের আশীর্বাদপুষ্ট হতে থাকে। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে উদারনৈতিক ও পাশ্চাত্যপন্থী নেতাকর্মীদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ গঠনের মূলে মুসলিম লীগের সাথে আদর্শগত বিরোধ থাকলেও আওয়ামী লীগ (জনগণের লীগ) কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ (জনগণের মুসলিম লীগ) নাম ধারণ করে। এ থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল মুসলিম লীগেরই একটি ভিন্নরূপ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারে বলা যায়, তথাকথিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং তার সাফল্য প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই জন্মলগ্নে পাকিস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে ধর্মীয় উন্মাদনা বিদ্যমান ছিল তাতে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে 'মুসলিম লীগ' নাম ব্যবহার করে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও স্বীকার করেছেন, "যে সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি 'সাম্প্রদায়িক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের ধর্মানুরাগের সুযোগে ইসলামকে হাতিয়ার করেই তার শাসন অব্যাহত রেখেছিল। জনগণও তখন লীগ সরকারের বিভ্রান্তি হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় আমাদের সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করা সম্ভব হলেও মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের মোকাবিলা করার কাজে তা ব্যর্থ হত।"(১) অর্থাৎ বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে থাকার জন্যই নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। একই কারণে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মুসলিম লীগবিরোধী ছাত্র সংগঠন গঠন করার সময়ও 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।(২)

বস্তুত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাছ থেকে সংগঠনভাবে অথবা এর নেতাকর্মীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা আশা করা উচিত নয়। এই রাজনৈতিক দলের 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া মেনিফেস্টো' শীর্ষক প্রথম দলিলটি রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মের নানাবিধ

নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। এতে মানুষকে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য "ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয় জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের" বলে বর্ণনা করা হয়। এই দলিলে রাষ্ট্রকে খেলাফত হিসেবে উল্লেখ করে আরো বলা হয়, "খেলাফত হিসেবে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইবে আল্লাহর উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষ মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।"(৩) এই বক্তব্য দ্বারা সকল ধর্মের তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের এই দলিলে 'দারুল ইসলাম', 'রব', 'রবুবিয়াত', 'রব্বানিয়াত' ইত্যাদি ইসলাম শব্দের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। তবে পাকিস্তানকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করে এবং আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের আধার হিসেবে গণ্য করে তার প্রতিনিধি জনগণকে এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়।(৪) এইভাবে সাংগঠনিক যাত্রার সূচনাকালে আওয়ামী লীগের ধারণায় রাষ্ট্রের এক প্রকার ধর্মীয় আবরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তথাপি রাষ্ট্র ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক নিম্নোক্ত বক্তব্য আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনায় গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা দরকার :

আধুনিক যুগে ধর্ম হলো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং এটা শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ধর্মের আওতার বাইরে। বর্তমানে বস্তু জগৎ হতে সম্পর্কহীনভাবে ধর্ম নিছক পারলৌকিক বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার। ইহকাল রাষ্ট্রের উপর এবং পরকাল ধর্মের উপর ন্যস্ত। ব্যক্তি জীবন স্রষ্টার এবং সমাজ জীবন রাষ্ট্রের, ধর্মের এইরূপ ধারণা এবং অর্থই এখন বিশেষ প্রচলিত এবং সর্বজনীন।(৫) পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির মূল ভিত্তিই এই উক্তির মধ্যে নিহিত। প্রতিষ্ঠাকালে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে যুগবৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করতে না পারলেও পরবর্তীকালে সকল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নীতি ও কর্মসূচিতে ধর্মীয় রং ক্রমান্বয়ে ধূসরতর হতে থাকে। আওয়ামী লীগ সর্বোতভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, ভাষা আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিসম্পন্ন আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্টের landslide বিজয়ে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগেরই সদস্য ছিল ১৪০ জন।(৬)

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে উদারনৈতিকতার পরশ লাগে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের প্রথম

কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সাংগঠনিক রিপোর্টে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত দাঙ্গাকে গণআন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্য গণ-দুষমনদের একটি হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এ সম্বন্ধে আরো বলা হয়, "এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া।" মানুষের এই চেতনাই ১৯৫০ সালের দাঙ্গার শিক্ষা।(৭) পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হতো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ এই সকল নেতিবাচক ইস্যু বর্জন করে সংগঠনকে ঐতিহাসিকভাবে অগ্রসর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।(৮)

১৯৫৩ সালেই দেশের অধিকাংশ লোক বিশেষত কর্মীদের বহুলাংশ প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করার জোর দাবীর(৯) প্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করা হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ১৯৫৫ সালে এ বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।(১০)

আওয়ামী লীগের এই সকল রূপান্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের সরকারের ক্রিয়াকলাপে ইসলাম ও মুসলমানিত্বের প্রাবল্য সম্বন্ধে কিঞ্চিত ধারণা থাকা দরকার। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে গণপরিষদে যে আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাতে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। কেবল মাত্র আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, 'ইসলামিক অনুশাসনের ভিত্তিতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা,' 'কোরান ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা' ইত্যাদি ছিল আদর্শ প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ দিক।(১১) আবার নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৫৪ সালে সংবিধান সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত গণপরিষদে গৃহীত হলে তাতে "একদিকে পাকিস্তানের জন্য পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা চালুর পক্ষে মত দেওয়া হয়, অন্যদিকে শরিয়তবিরোধী কোন আইন গ্রহণ না করার দাবি মেনে নেওয়া হয়। কোন আইন শরিয়তবিরোধী কিনা তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পাঁচ সদস্যের একটি উলেমা বোর্ডকে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যের পরিবর্তে উলেমাদের নিয়ে একটা এক্সট্রা-পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করার অর্থ ছিল দেশের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও অনগ্রসর একটি গ্রুপের হাতে দেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে চূড়ান্ত ভোট দেওয়ার অধিকার অর্পণ করা।"(১২)

দেশের সরকার, রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এই ধর্মীয় উন্মাদনাময় পরিবেশে আওয়ামী লীগের নতুন নামকরণের মাধ্যমে উদার ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র

গ্রহণকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন বিরোধিতা করেনি। সম্ভবত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করলে আওয়ামী লীগ ব্যাপক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতো, এই আশঙ্কায় তারা এ বিষয়টি হালকাভাবে গ্রহণ করেন।(১৩)

১৯৬০-এর দশক আওয়ামী লীগের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকে আওয়ামী লীগ বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও তেজোদীপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ভাস্বর শেখ মুজিবুর রহমান এই সময় আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বে আসীন হন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বারের ন্যায় ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও গ্রহণ করে। এই ঘোষণাপত্র ছিল নিরঙ্কুশভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা বিবর্জিত। প্রথম ঘোষণাপত্রে ইসলামের ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়ে পাকিস্তানকে দারুল ইসলামে পরিণত করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোন উচ্চারণই ছিল না। বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে সুস্পষ্টভাবে জাতীয়করণ নীতির উপর জোর দিয়ে প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে মিশ্র-অর্থনীতির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হয়।(১৪) ১৯৬৪ সালেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম তাদের আস্থা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। ষাটের দশকের আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে পরিচালিত সকল আন্দোলনের চরিত্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এই সকল আন্দোলন সকল ধর্মের মানুষকে ভাষা সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় একাত্ম করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যাভিসারী করেছে। ১৯৭৯ সালে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৯৬২ সালের আইয়ুবীয় সংবিধানের একটি খসড়া সংশধনী প্রস্তুত করা হয়। এতে সংবিধানের গণতন্ত্রায়ণ করা হলেও পাকিস্তানে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীর রাষ্ট্রপতি না হওয়ার বিধান এবং রাষ্ট্রের ইসলামী রিপাবলিকের বিষয়টি অক্ষুন্ন রাখা হয়।(১৫) বিষয়টি যেকোন গবেষক-পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। কিন্তু পাতি-বুর্জোয়া ধারার একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দৃষ্টি ছিল সাধারণ নির্বাচনের দিকে।

নির্বাচনী রাজনীতির কারণেই সম্ভবত আওয়ামী লীগ প্রায় ৮০% মুসলমানের দেশ পাকিস্তানে সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের নাজুক ধর্মীয় অনুভূতির কথা চিন্তা করেই ধর্মীয় বিষয়ে কোন র‍্যাডিকাল বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকে। বাস্তবিক অর্থে পাকিস্তানে ধর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নজির বহু পুরাতন। তাই ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের আক্রমণকে আড়াল করার জন্য

জাতীয়তাবাদী এলিটরা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করার অঙ্গীকার করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার '২১-দফায়' এই ঘোষণামূলক অঙ্গীকারের স্থান না হলে মওলানা ভাসানীর নির্দেশে শিরোনামের নিচেই এই 'নীতি' স্থান পায়।(১৬) বাঙালির দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমণের পরও ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ একই কৌশল গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগের ঘোষণা অথবা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাষণেও বিষয়টি প্রকটিত হয়। (১৭,১৮) নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এগুলি বুর্জোয়া ধারার রাজনীতির একটি নির্বাচনী বক্তব্য। তবে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে কখনই দলীয় ভাবাদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। অবশ্য এই দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমানাধিকারের রক্ষাকবচের কাজ করেছে। যেমন, ১৯৭০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচিতে বলা হয়।

> শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতার রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে এবং সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমমর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারেও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।(১৯)

বস্তুত ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণার সাথে বাঙালির মানসিক দুরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। তারা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে পাকিস্তানী হিসেবে নয় বরং বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, রাওয়ালপিন্ডির পরিবর্তে ঢাকায় আত্মানুসন্ধান করে এবং পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় নিজের ঠিকানা ঘোষণা করে। 'জয় বাংলা' স্লোগানে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়। এই অবস্থায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিরা ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র, এর আদর্শগত ভিত্তি, সাংবিধানিক ঘোষণা সবই অতীতে পরিণত হয়।

পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিবর্তে ভাষা সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি multi-religious society-র ধারণাকে ধারণ করে, যদিও বাস্তব রাজনীতির কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় ভাবাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭১ সালে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষের চরম ত্যাগের বিনিময়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে আওয়ামী লীগ বিলম্ব করেনি। ১৯৫০-এর দশক থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চেতনার ঊর্ধ্বে থেকে আওয়ামী লীগ যে রাজনীতির অনুশীলন করেছিল তার ঐতিহাসিক

পরিণতি হিসেবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের চারটি মূল নীতির অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সমগ্র পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিপরীতে রাজনীতি করে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বাস্তববোধের জন্ম হয় তা থেকেই আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, তাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে নয় বরং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। ১৯৭২ সালের জুনে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ওপর আলোকপাত করেন।(২০)

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর গণপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির ব্যাখ্যাদানকালে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু একই কথা বলেন।(২১)

বাংলাদেশের সংবিধানের মুখবন্ধেই শুধু অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজিত হয়নি বরং সংবিধানের operative অংশেও এই নীতি কর্যকরী করার বিধান রাখা হয়। এ বিষয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষ সমিতি ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকবে না।"(২২)

এভাবে সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চর্চার পথ বন্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ সুগম করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতা চর্চাকারীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান শেখ মুজিব।(২৩)

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আওয়ামী রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের বাইরে তেমন সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তবে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সমালোচনার আঙ্গিক ছিল ভিন্নতর। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে পাকিস্তানের ভাবাদর্শিক ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত হলে সহজাত পাকিস্তানপ্রীতির কারণে দক্ষিণপন্থীরা বিপদাপন্ন হয়। ফলে সংবিধানে রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সন্নিবেশ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ৩৮ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হলে তাদের রাজনীতি চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ভারতের চাপে আওয়ামী লীগ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে বলে মত পোষণ করেন। অথচ স্বয়ং ভারতীয় সংবিধানেই

১৯৭২-এর চার বৎসর পর ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সংযোজিত হয়।(২৪) এই অসত্য বক্তব্য প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল রাজনীতিতে আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থী হিসেবে ব্র্যাকেটবন্দী করে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা। বস্তুগত উন্নয়নের জন্য পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের জনচেতনা এবং সাংস্কৃতিক মানের দুর্বলতার কারণে এই প্রচারণা গুরুত্ব পায়। অপরদিকে বামপন্থীদের সমালোচনার ধারাটি বিপরীতধর্মী। আওয়ামী লীগের বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিই মনে করেন না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক পরিমণ্ডলে বাঙালি মুসলমানের জীবনাচরণে যে সকল সহজাত ধর্মীয় উপাদান কাজ করে সেগুলো পর্যন্ত উচ্ছেদ না করায় তারা সমালোচনা করেন। এরা পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম অর্থে ধর্মনিপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করেন। ফলে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ইসলামের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যোগদান, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখা, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসরদের প্রতি নমনীয় মনোভাব ও ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়।(২৫) বস্তুত বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের ব্যাখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে সকল ধর্মের সমান মর্যাদা, কিংবা অসাম্প্রদায়িকতা মনে করেন না। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ইহজগত সচেতনতা, ধর্মের বিরাষ্ট্রীয়করণ বা ব্যক্তিগতকরণকে বোঝেন।(২৬) কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় এ ধরনের পাশ্চাত্যের বাস্তবতায় প্রয়োগযোগ্য যান্ত্রিক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি যে বাংলাদেশের মত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য বাস্তবোচিত ছিল তা প্রমাণিত হয় ১৯৭৫ সালের পর। ১৯৭৫ সালের আগস্টে এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হন। এর তিন মাস পর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ মুক্তিযুদ্ধের চার পুরোধা নেতৃত্বকে জেলখানার অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়। এর পর থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের দক্ষিণমুখী ভাবাদর্শিক যাত্রা। এই অব্যাহত যাত্রায় দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তবে সবচেয়ে ক্ষতি হয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির। ১৯৭৫ সালের রক্তক্ষয়ী ও রাষ্ট্রাদর্শবিনাশী ঘটনাবলীর প্রধান রাজনৈতিক বেনিফিসিয়ারি হলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই মূলত সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও পূর্বকথিত ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। পরে ক্ষমতায় থেকে তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলে ১৯৭৫-পূর্বকালের বহু বামপন্থী বিপ্লবী যেমন যোগদান করেন

তেমন ১৯৭১-এর আগের পাকিস্তানবাদীরাও যোগ দেন। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিনষ্ট হয়ে বিপ্রতীপ আদর্শের লোকদের নিয়ে ভারসাম্যের রাজনীতি শুরু হয়। এই বিপ্রতীপ আদর্শের লোকেরা পূর্বেও আওয়ামী লীগ-বিরোধী ছিলেন ভারসাম্যের রাজনীতিতেও তারা আওয়ামী লীগ-বিরোধী নতুন এক রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলেন। সংবিধানে সন্নিবেশিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি এই নতুন ধারার হাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৭৬ সালের ১ মে সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান চীনপন্থীদের একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে অবাধে ধর্মকর্ম পালন করতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। এর মাত্র দুদিন পরে সামরিক ফরমান বলে স্থগিত সংবিধানের ৩৮ ধারাটি বাতিল করা হয়। ফলে ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়।(২৭) এই সময় বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের মূল নিয়ন্তা ছিলেন জিয়াউর রহমান। জিয়া ও সায়েমের যৌথ প্রশাসন ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ কোলাবোরেটর্স আদেশ বাতিল করে দেয়।(২৮) ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল কোন কারণ ছাড়াই সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরদিনই নতুন রাষ্ট্রপতি গণমনে অসন্তোষের দোহাই দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭২-এর স্থগিত সংবিধানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করেন। এই সংশোধনীতে সংবিধানের শিরোনামের নীচে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এই আরবি শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশ করা হয় এবং চার রাষ্ট্রাদর্শের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তন করে তদস্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়।(২৯) জিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের অধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া জেনারেল এরশাদের আমলে ত্বরান্বিত হয়। এরশাদও সামরিক আইন জারি করে হুবহু জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং রাষ্ট্রের দক্ষিণমুখী পদযাত্রাকে দৌড়ে পরিণত করেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী দ্বারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সংশোধনীতে 'অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে' বলে ঘোষণা থাকলেও এই রাষ্ট্রধর্মের বিধান দ্বারা রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের hegemony প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের ফলে রাষ্ট্রের চোখে নাগরিকরা আর নাগরিক নয় বরং তারা মুসলমান নাগরিক, হিন্দু নাগরিক ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সকল ধর্মাবলম্বীদের সমানধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালির প্রত্যয় পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭৫-পরবর্তী সরকারসমূহের উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির চেহারা কি হয়েছে তা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরির নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণে:

পঁচাত্তরের রক্তাক্ত ঘটনা রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাতস্বরূপ। ক্ষমতায় আরোহণের প্রক্রিয়ায় জিয়াউর রহমান বামপন্থীদের উগ্র অংশের এবং দক্ষিণপন্থীদের সকল মহলের সমর্থন পান; এবং ক্ষমতায় আরূঢ় অবস্থায় তিনি যে তাঁর নির্ভরের বন্ধু কর্ণেল তাহেরকে হত্যা করেন তাতে বোঝা যায় যে, তাঁর পথ বামদিকে নয়, প্রসারিত ছিল দক্ষিণমুখো। জিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা যে ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী ছিলেন সেটা সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে তিনি যে সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো আনেন সেখানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। পরে এরশাদ এসে আরোও এগিয়ে গেছেন, তিনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের প্রবর্তন করেছেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্র ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাঙালিরা জানতো যে ঐ রাষ্ট্র তাদের মিত্র নয়, শত্রু বটে; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। অজান্তে হলেও। কিন্তু এখন যখন রাষ্ট্রকে মানুষ জানে মিত্র হিসেবে তখন রাষ্ট্রের ধর্মানুগত্য তাদেরকে বিপদে ফেলেছে।(৩০)

এভাবে ১৯৭৫ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘ দিনের লালিত ও অর্জিত আদর্শগুলো বিনষ্ট হওয়া অবলোকন করে। পঁচাত্তরের পূর্বে যে সকল বামপন্থী আওয়ামী লীগের নীতিসমূহের সমালোচনমুখর ছিলেন তাদের অধিকাংশ বামপন্থীও ইহজাগতিক চেতনা ত্যাগ করে সামরিক শাসকদের সাথে যুক্ত হয়ে বৈধকরণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। বামপন্থীদের স্বপক্ষ ত্যাগে একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়ার পাল্লা ভারী হয় তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ অঙ্গন শূন্য হতে থাকে। ১৯৯০ সালের পর এই প্রবণতা তীব্রতর হয়। ১৯৯১ সালের পর থেকে তাই আওয়ামী লীগাররা নতুন করে যেন 'মুসলমান হওয়ার' প্রতিযোগিতায় নামেন। তাঁরা ঘন ঘন মক্কায় হজব্রত পালন করতে যান, নামের আগে আলহাজ বা হাজি সংযোজন করেন, মসজিদে যান এবং মসজিদে যেতে অধস্তনদের অনুপ্রাণিত করেন। আগেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নীতিগতভাবে ধর্মবিরোধী বা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ১৯৭৫-এর পর ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদীরা আওয়ামী লীগকে ইসলাম-বিরোধী হিসেবে যে প্রোপাগান্ডা চালায় তা মোকাবিলার জন্যে আওয়ামী লীগাররা বিসমিল্লাহ বলাসহ চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে দৃশ্যমানভাবে সাচ্চা মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা চালান। আওয়ামী লীগারদের এরকম করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে। পঁচাত্তর পরবর্তী বাস্তব তাই তাদের জন্য এই বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আওয়ামী লীগ আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করেনি।

সূত্র নির্দেশ :

১. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ সন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট, পৃ. ২৬।

২. বিস্তারিত দেখুন : সায়েরা সালমা বেগম, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্রলীগ, ১৯৪৯-১৯৭১ মূলধারা পর্যালোচনা", (অপ্রকাশিত এম) ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৩৯-৪৭।

৩. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো, পৃ. ৯।

৪. ঐ

৫. ঐ পৃ. ১।

৬. Rangalal Sen, Political Elites in Bangladesh (Dhaka : UPL, 1986), P. 125.

৭. পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন সাংগঠনিক রিপোর্ট ১৯৫৩ সাল, পৃ. ৩।

৮. ঐ পৃ. ৪

৯. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, পৃ. ২১।

১০. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯৫৫ সন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট, পৃ. ২৬।

১১. ড. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, (ঢাকা সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৪৭।

১২. হাসান ফেরদৌস, 'ঠেকাতে হবে এখনই', প্রথম আলো, জানুয়ারি, ১৭, ২০০৪।

১৩. এ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃ. ৭০-৭১; এই বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মনোভাবের জন্য দেখুন, আনিসুজ্জামান, ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা ১৯৯২ (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৭।

১৪. Shyamali Ghosh, The Awami League 1949-1971. (Dhaka Academic Publisher, 1990), pp. 287-287-292.

১৫. এই খসড়া সংশোধনীর জন্য দ্রষ্টব্য : Modud Ahmed, Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy, (Dacca : UPL, 1979), pp. 281-320.

১৬. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১৭. Morning News. June 8. 1970.

১৮. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা), বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, (ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৭৯), পৃ. ১৪-১৫।

১৯. ইত্তেফাক. জুন ৭. ১৯৭০।

২০. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২১. ঐ পৃ. ১১৮।

২২. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, (ঢাকা : ইউপিএল ১৯৯৩), পৃ. ২৭৩-২৭৪।

২৩. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

২৪. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি (কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩) পৃ. ১৪৫-১৪৬।

২৫. বামপন্থী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের অজস্র লেখায় এ ধরনের সমালোচনা আছে।

২৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালির জাতীয়তাবাদী, (ঢাকা : ইউ. পি. এল. ২০০০) পৃ. ৩২১।

২৭. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৩-২৭৪; Article 38 was omitted by the Second Proclamention Order No. III of 1976. See: The Constitution of the People Republic of Bangladesh [As modified upto 30th June. 1994), P. 24.

২৮. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

২৯. ঐ পৃ. 284 Golam Hossain, General Ziaur Rahman and the BNP : Political Transformation of a Military Regime. (Dhaka: UPL, 1988) P. 18.

৩০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

বাংলাদেশের জাতির জনক :
বহুজনের বর্ণনায় বরণীয় বঙ্গবন্ধু

রামেন্দ্র চৌধুরী

এক

কয়েক বছর আগে একদিন প্রবীণ-প্রাজ্ঞ ক'জন মানুষের ঘরোয়া আলোচনায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। নানা খাতে নানা মতে প্রবাহিত আলোচনার স্রোতধারা সেদিন ছুঁয়ে গেছে পাঠান-মোঘল থেকে নবাব সিরাজ হয়ে শেখ মুজিব অবধি। আলোচিত হলো, সমকালীনতার আবেগ-স্বার্থক্ষোভের মিশ্রণ ঘটতেই পারে ইতিহাসে, কিন্তু সময়ের পরিশীলনে কেবল নির্মোহ সত্যটাই টিকে থাকে। ইতিহাস স্থবির নয়, বরং নিরন্তর পরীক্ষা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই চির-চলমান। নবাব সিরাজের ওপর অন্ধকূপ হত্যাসহ নানা কলঙ্ক আরোপ করেছিল ইংরেজরা। আবার চলমান ইতিহাসই মানুষকে জানিয়েছে, যারা ইংরেজের শঠতা, পলাশী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রমূলক বাস্তবতা এবং মীরজাফর গংয়ের বিশ্বাসঘাতকতাকে আড়াল করে দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন এবং সিরাজ-হত্যাকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, তারাই সিরাজকে কলঙ্কিত করেছিল। সুতরাং পরবর্তী সময়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে প্রতীকী মর্যাদায় স্বীকৃত সিরাজ অপেক্ষা ইংরেজ-মীরজাফর কথিত সিরাজকে সত্য বলে মানবো কোন যুক্তিতে?

জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি কথার সূত্রে অনিবার্যভাবেই উঠে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপস্থিত প্রাজ্ঞজনেরা সেদিন আবেগ-শ্রদ্ধার প্রসারিত ক্যানভাসে যুক্তি-তথ্য-বিশ্লেষণের রং-তুলিতে যে ছবি এঁকেছিলেন, তাতে মুজিব কখনো সিরাজ-সমান্তরাল, কখনো হাজার বছরের বাঙালির মানবিক সংস্কৃতি চেতনার রাজনৈতিক প্রতিমূর্তি, অথবা যেন নেতাজী সুভাষের সম্প্রসারিত সত্তা। মনে হলো, বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্বকবির যে প্রভাব, মুজিব যেন তারই প্রতি-তুলনীয় রাজনীতির কবি। "মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে, দেখিবে যে অন্যায় ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা' চেয়ে"-বঙ্গবন্ধু তো আজীবনের কর্ম-সাধনায় তারই সফল রাজনৈতিক সংস্করণ রচনা করে একটা জাতিকে নির্ভয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তির যুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে মীরজাফরের চক্রান্ত, সিরাজের পরাজয় আর নেতাজীর অসমাপ্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র বাঙালি নেতা, যিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয় অর্জন করতে পেরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে যে ভূমিকা ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের, ভারতে মহাত্মা গান্ধীর, ইন্দোনেশিয়ায় বাংকার্নো নামে অভিহিত সুকর্নোর, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন মেন্ডেলার, ঠিক তেমন ভূমিকাই ছিল বাংলাদেশে শেখ মুজিবের। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুজিবকে পৃথক করে ভাবার তো কোনো সুযোগ নেই।

আলোচনার আলোটা উস্‌কে দেবার জন্যই একজনের প্রশ্ন ছিল, বঙ্গবন্ধু কি সত্যি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? প্রশ্নটির সংবেদনশীলতা বুঝলাম তখনই, যখন একসাথেই নানা-মুখে শব্দভেদী বাণ ছুটলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল একটি সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্য চূড়ান্ত পর্যায়, তার পূর্ব-প্রস্তুতির কথা আর সমগ্র জাতিকে এক লক্ষ্যে সংগঠিত করার অবিরত অনিবার প্রচেষ্টার কথা ভুলবো কি করে? পাকিস্তানের সিকি-শতাব্দীর ইতিহাসে মুজিব তো কখনো লক্ষ্যচ্যুত হননি, কখনো আপোষ করেননি কায়েমী স্বার্থের সাথে। প্রশ্নাতীত আপোষহীনতার মূল্যই তাঁকে দিতে হয়েছে সপরিবারে ঘাতকের হাতে নিহত হয়ে। অপরিচিত এক সামরিক কর্মকর্তার হঠাৎ হুকুমে সমগ্র জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ভাবতে হলে শুধু ইতিহাস-মনস্কতা নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অর্জন এবং যুক্তিবোধও বিসর্জন দিতে হয়।

প্রাজ্ঞ প্রবীণদের আলোচনা শুনতে শুনতেই আমার মনে হয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান তো আজীবন নির্ভীক রাজনৈতিক সংগ্রাম সাধনার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। বিদগ্ধ বহুজনের কথায়–লেখায় এক অনন্য মানুষ, প্রতিবাদে-প্রতিজ্ঞায় অবিচল রাজনীতিবিদ মুজিবের পরিচয় মেলে। তাঁর অবিচল সংগ্রামের সাফল্যেই আমরা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধ জয়ী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সার-কথা হিসাবে শুরুতেই উদ্ধৃতিযোগ্য মন্তব্য 'Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy' নামক গ্রন্থের লেখক এসএ করিমের : 'No one can deny that Sheikh Mujib was a larger-than-life figure in the political landscape of the subcontenent... the founding father of a new nation : Bangladesh".

১৯৪৭-এ পাকিস্তান নামক একটি অ-স্বাভাবিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। "বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-১৯৭৫" গ্রন্থের লেখক হালিম দাদ খানের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "আমাদের পিতৃ-প্রজন্ম একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন বা প্রতারিত হয়েছিলেন অথবা শিকার হয়েছিলেন দুটোরই। তারা 'পূর্ববঙ্গ'কে পাকিস্তানের অংশ করে 'পূর্ব পাকিস্তান' বানিয়ে ফেলেছিলেন"। কিন্তু সেই ভুল বা প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে এদেশের মানুষের আদৌ বেশি সময় লাগেনি। "ফলে মাত্র দুই যুগ কাল পার হতে না-হতেই আমাদের প্রজন্ম ১৯৭১ সালে পূর্বপুরুষের ভুলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'

রাষ্ট্র"। এই যে এক প্রজন্মের ভুল পরের প্রজন্মেই সংশোধন করা গেলো, সেক্ষেত্রে দু'টি প্রজন্মের মাঝে যোগসূত্র বা অনস্বীকার্য পথ-প্রদর্শকের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনকারীর খোঁজে পেরিয়ে-আসা ইতিহাসের পাতা খুললে পাওয়া যাবে মুজিবকেই— যিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন অনেকজনের মাঝে অনন্য একজন।

মাত্র ২৪ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১ ইং) পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গতিপথে দিকচিহ্নমূলক কয়েকটি ঘটনা হচ্ছে : আটচল্লিশে ভাষা আন্দোলনের সূচনা, বায়ান্নর শহীদ দিবস, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছেষট্টিতে ছয়-দফা ঘোষণা, উনসত্তরের গণ-অভুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন ইত্যাদি। অতঃপর একাত্তরে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ। ঐতিহাসিক এসব ঘটনায় মুজিব ছিলেন কখনো আপোষহীন সংগ্রামের সাথী, কখনো সংগঠক এবং কখনো অবিসংবাদিত নেতা। ঐ সময়কালে লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো, সকলের পরম আস্থাভাজন নেতাও ছিলেন একজন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দিয়ে এ ভূখণ্ডে সচেতন প্রতিবাদী রাজনীতির সূত্রপাত, বিকাশ-বিবর্তনের পথ পেরিয়ে সেটাই হয়ে উঠেছিল 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' আর 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। এরই মাঝে বহুবার রাজপথের জনতা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে : 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। পৃথিবীর খুব বেশি দেশে তো একক কোনো নেতার নামে কোটি জনতার কণ্ঠে এমন আস্থা-মুখরিত প্রতিবাদী স্লোগান উচ্চারিত হয়নি; বাংলাদেশে তো আর কোনো নেতার নামেই নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'হঠাৎ পাওয়া ধন' বলে অবমূল্যায়ন না করলে মানতেই হয়, বঙ্গবন্ধু মুজিব আপন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞায়, সতত আপোষহীন সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে একটি সুস্থির রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংগঠিত এবং সক্রিয় করতে পেরেছিলেন। নিঃসংশয় লক্ষ্যটি ছিল বাঙালির জাতীয় পরিচয় অর্জনের, স্বাধীন স্বদেশ, একটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।

'ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক' গ্রন্থের আলোচনা সভায় (৬ ডিসেম্বর, ২০০১ইং) অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যথার্থই বলেছিলেন, "২৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে বোঝা যাবে না।... হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হকের মত অভিজ্ঞ নেতারাও অনেক অবদান রেখেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ হয়েও একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না।" অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, যিনি জামায়াত-বিএনপি জোট-সরকারের আমলে মৌলবাদী ঘাতকের নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়ে কিছুদিন পরে প্রবাসে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, "রাজনীতিক মহাপুরুষদের প্রতি আমি বিশেষ শ্রদ্ধা/আকর্ষণ বোধ করি না"। অথচ তিনিই লিখেছেন, "ওই রাজনীতিক আকাশে একটিই নক্ষত্র ছিল, তাঁর নাম... শেখ মুজিব।... ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন আমাদের রাজনীতির প্রধান

পুরুষ, এবং ঐতিহাসিক বিচারেও তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আর কোন বাঙালি রাজনীতিবিদ নেই।... তাঁর পাশে অগ্রজরা মাঝারি, অনুজরা তুচ্ছ...। তিনি শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করেননি, তিনি যুগান্তর ঘটানোর রাজনীতি করেছেন"।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপুল প্রসারিত পশ্চাদপট সম্পর্কে নিতান্ত অনাগ্রহী যারা, তাঁরাও এড়িয়ে যেতে পারেন না, এদেশের রাজনীতির উথাল-পাথাল সময়ে, একাত্তরের ৭ মার্চ প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে। দেশ-বিদেশের অনেক বিশ্লেষকই সেই ভাষণটিকে বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসের অন্যতম সাহসী সু-ভাষণ এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যভেদী নির্দেশনামূলক ভাষণ বলে উল্লেখ করেন। প্রবীণ প্রাজ্ঞজন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের পর্যবেক্ষণ, ১৯৭১-এর ৭ মার্চ কল্পনারও অধিক জনসমুদ্র ছিল রেসকোর্সে, মাথার ওপর আকাশে ছিল পাকিস্তানীদের জঙ্গী বিমানের গর্জন। "সেই গর্জনকে ভাষণের অত্যুঙ্গতায় অতিক্রম করে এক দীর্ঘদেহী যুবক মঞ্চ থেকে বিমানের চাইতেও অধিকতর বজ্রের নিনাদে উচ্চারণ করেছিলেন... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বিশেষভাবেই উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নিজের লেখাতেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিকে মুক্তিযুদ্ধের 'গ্রীন সিগন্যাল' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের অব্যাহত চক্রান্ত এবং ২৪ বছরের অত্যাচার-নির্যাতন-বঞ্চনার আবেগাপ্লুত বর্ণনা দেবার পাশাপাশি বিদ্যমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কেও জনগণের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ভাষণে ব্যক্ত ক্ষোভ-দুঃখ-প্রতিবাদের অনেক কথার সাথে, সুদৃঢ় কণ্ঠেই মুজিব বলেছিলেন, "মরতে যখন শিখেছি, আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না", "আর যদি একটা গুলি চলে...", "আমি যদি আর ডাক দেবার নাও পারি,... যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে", "রক্ত যখন দিয়েছি... এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ", "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"।

পরবর্তী সময়ে, মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিএনপি আর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতের জোটবদ্ধ শাসনামলে ইতিহাস বিকৃতি-অস্বীকৃতির অপরিণামদর্শী ডামাডোলে সংক্ষুব্ধ হয়েই প্রবদ্ধ অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমকে বলতে হয়েছিল, পৃথিবীর সব দেশেই মানুষ মনে করে "কোনো মহৎই তার কাছে অতীত নয়। সব মহৎই তার কাছে বর্তমান। কেবল আমাদের বাংলাদেশেই অতীত মানে বিস্মৃত,... বর্তমান মানে অতীতকে অস্বীকারকারী এক যাযাবর।" একাত্তরের ৭ মার্চ প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর উজ্জীবক বক্তব্যকে যারা স্বাধীনতা ঘোষণার কিংবা অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিতবাহী বলে মানতে নারাজ, তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে। তবে শুধু সংশয় নয়, যারা নিজ কানে শোনেনি

বলে সকল তথ্য-প্রমাণ এড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করে কার্যত ইতিহাসের বিরুদ্ধেই অবস্থান করেন, সন্দেহ জাগে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ-অভিলাষ সম্পর্কেই।

দুই

আজীবন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অভ্যস্ত কিন্তু লক্ষ্য-প্রতিজ্ঞায় অটল বঙ্গবন্ধু, ঢাকার মানুষের ওপর ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকসেনাদের অমানবিক আক্রমণ, 'অপারেশন সার্চ লাইট' শুরুর পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডালের হিসাবে তখন ২৬ মার্চ। ইতিহাসের পাতায় আজ যতই কাটাকুটি আর কালিমা লেপন করা হোক, ২৬ মার্চই চিহ্নিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণাটি দেশের নানা অঞ্চলে টেলিফোন-টেলেক্স-ওয়ারলেস মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং নানাজন নানাভাবে সে বার্তার প্রচারও করেছিলেন, যাদের অনেকেই এখনো জীবিত আছেন। চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী, সেই দারুণ দুঃসময়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণকারী সুধীজন বেলাল মহম্মদ ২৭ মার্চ পটিয়া গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেই জিয়াকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণা' পাঠের জন্য। জিয়া নিজেই লিখেছেন, "২৭ মার্চ শহরের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রেডিও স্টেশনে এসেছিলাম", (সরদার সিরাজুল ইসলাম, 'মেজর জিয়ার বেতার ভাষণ', 'জনকণ্ঠ', ২৬-৩-০৪)।

সাক্ষাৎ আলোচনায়, তথ্যবহুল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামের বইটির লেখক বেলাল মহম্মদের সরাসরি মন্তব্য শুনেছি, ঘোষণা প্রদান আর পাঠ করা এক কথা নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের জন্য অধিকার-কর্তৃত্ব থাকতেই হয়, যা ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুর, অন্য কারোরই নয়। ঘোষণা পাঠ বা প্রচার করতে পারে যে কেউ, "আমিও করেছিলাম, কিন্তু ঘোষণা প্রদানের দাবিদার আমি নই, হতেও পারি না"। তিনি আরো বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান ২৬ মার্চ সকালেই চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি মাইকে প্রচার করেছিলেন এবং পরে বেতারেও পাঠ করেছিলেন। ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দীপ। অনস্বীকার্য প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবেই মানতে হয়, জিয়ার পক্ষে ২৭ মার্চ সন্ধ্যার পূর্বে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি বেতারে পাঠ করা সম্ভব হয়নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি দেশের নানা অঞ্চলে টেলিফোন-টেলেক্স-ওয়ারলেস মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং নানাজন নানাভাবে সে বার্তার প্রচারও করেছিলেন। সম্ভবত এজন্যই উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সম্পর্কে নানা পাঠান্তর-ভাষ্য বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়। ২৫ মার্চ রাতের ঢাকা ও বঙ্গবন্ধুর বাসস্থানের পরিস্থিতি এবং উপস্থিত নেতাকর্মীদের অবস্থার আংশিক উপলব্ধি করতে

পারলেও, এমন ধারণাই যুক্তিসঙ্গত যে, বঙ্গবন্ধুর মূল ঘোষণাটি বিভিন্ন জন নিজ নিজ উদ্যোগে নানা মাধ্যমে নানা স্থানে প্রেরণ করায় স্বাভাবিক ভাবেই শব্দান্তর-ভাষান্তর ঘটে গিয়েছিল। এবং সবাই অবশ্যই একসঙ্গে বার্তাটি সর্বত্র প্রেরণ করতে পারেননি, এমনকি মুজিবের গ্রেপ্তারের পরেও নানা সূত্র থেকে বার্তা প্রেরণের বিষয়টিও স্বাভাবিক ছিল বলেই মানতে হয়। তবে কেউই নিজ নামে ঘোষণাটি প্রেরণ করেননি, বরং সব সূত্রেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সংবাদদাতা মুসা সাদিক লিখেছেন, চট্টগ্রামে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১-১০ মিঃ অর্থাৎ সেটা তখন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহর। আমিও পড়লাম সেই টেলেক্স মেসেজ : "This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh... until the last soldier of occupation army is expelled from Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman" (জনকণ্ঠ), ৩০-৩-০২)। এস এ করিম তাঁর বইতে লিখেছেন, চট্টগ্রামে 'ইত্তেফাক' করেসপন্ডেন্ট মইনুল আলম ওয়্যারলেস অপারেটরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর একটি বার্তা পেয়ে ২৬ মার্চ ভোরে টেলিফোন করে আওয়ামী লীগ নেতা এম. আর. সিদ্দিকীর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন– "Message to the people of Bangladesh and to the people of the world. Rajarbagh police camp and Peelkhana EPR subdenly attacked by Pak Army at 2400 hours... Apeal to the world people for help in freedom struggle... Joi Bangla". বার্তাটি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বেলা ২:৩০ মিনিটে বেতারে পাঠ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সিভিল ওয়ার' বললেও, ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ডেটলাইনে ঢাকা থেকে বেলা ২:৩০ মিনিটে হোয়াইট হাউসে প্রেরিত মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing... the soverign independent People's Republic of Bangladesh"- নথিটি ৩০ বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে "Freedom of information Act" অনুসরণে মার্কিন সরকারই সাধারণ্যে প্রকাশ করেছে। তথ্য মেলে বাংলার শত্রু, মুজিব শত্রুদেরও বক্তব্যেও। ২৬ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়ার প্রচারিত বেতার ভাষণে বলা হয় "Sheikh Mujib is a traitor and this time he and his party Awami League shall not go unpunished."

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ওপর ইয়াহিয়া খান তথা পাকজান্তার ক্রোধের কারণটাও স্পষ্টই জানা যায় 'বাংলার কসাই' টিক্কা খানের জবানীতে, "... মাইনে খোদ শেখ সাব কো রেডিও পর... independence কা এলান করতে হুয়া সুনা... ম্যঁয়ে শেখ সাব কি আওয়াজ আচ্ছি তেরা পেহছান তা থা... And I had

no option but to arrest him" ("জনকণ্ঠ", ৪-০৩-০২)। টিক্কা খানের কথা থেকেই জানা যাচ্ছে, শেখ মুজিবের স্বকণ্ঠেও স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রচারের সময়টা ছিল নিশ্চয়ই ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২:০০টা থেকে ১:০০টার মধ্যে, কারণ রাত ১২টায় রাজারবাগ-পিলখানায় পাকসেনাদের আক্রমণের কথা বঙ্গবন্ধুর বার্তায় উল্লেখিত আছে আর এস.এ. করিম লিখেছেন, রাত ১:০০ টার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য পাকসেনারা তাঁর বাসায় প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেননি কিংবা বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র কোনো তথ্য দুনিয়ার কোথাও নেই বলতে হলে জ্ঞানপাপী হতেই হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রসঙ্গে বিদেশী সংবাদ-মাধ্যম থেকেও বহু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'দ্য টাইমস' ২৭ মার্চ ১৯৭১ ইং প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হেডলাইনে ছেপেছিল, "Heavey fighting as Sheikh Mujibur declares E Pakistan Independent" আর 'দ্য গার্ডিয়ান' লিখেছিল, "Shortly before his arrest, Mujib had issued a proclamation to his people, which informed them : you are citizens of a free country"— অর্থাৎ সে সময়টাতে আক্রান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা এবং স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদানকারীর পরিচয়টা, আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মী বা মুজিব-অনুগত কেউ নয়, বিদেশীরাই প্রচার করেছিল বিশ্বময়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কর্মে যুক্ত প্রাক্তন কুটনীতিবিদ এবং বর্তমানের সুপরিচিত কলামিস্ট মহিউদ্দিন আহমদের লেখায় পড়েছি, পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ক'দিন পরে এক আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়ন নেতা মিঃ মিলি ভিয়েনায় বাংলাদেশের কুটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদকে প্রশ্ন করেছিলেন, "How could you do it?" আর ঐ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ ১৬ বছর পরে জনাব মহিউদ্দিনই আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবারের প্রশ্নকর্তা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার অন্যতম বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক তাঞ্জানিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ারে। প্রশ্নের আকারে তাঁর বিষাদ-বিস্ময়, ক্ষোভ আর হতাশাই প্রকাশ করেছিলেন, "He gave you a country and you killed him?" ('জনকণ্ঠ', ৪-০৪-০২)। ভিন্ন মর্যাদা-পরিচয়-পরিবেশের দু'জন সুখ্যাত মানুষের মন্তব্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুই যে বাংলাদেশের স্থপতি, এ বিষয়ে বিশ্বসমাজের কোনো সংশয় কখনো ছিল না।

"ইতিহাস বিকৃতিই বাংলাদেশের ইতিহাস"–চরম গ্লানিকর হলেও অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের এমন তীর্যক মন্তব্যটি অস্বীকার করা সহজ নয়। বাংলাদেশে যেন চর দখল, নদী দখলের মতই কখনো আক্রমণে কখনো আপোষে ইতিহাস

দখলেরও প্রয়াস চলে নিরন্তর। ইদানীং তো মাঝে মাঝে, ছাত্রশিবিরও ব্যানারে লিখে, "স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীনতা রাখবো "।

তিন

"হাউই উড়িয়া কহে, মোর কী সাহস ভাই/ তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই/ কবি কহে, তারকার গায়ে লাগেনাতো কিছু / সে-ছাই ফিরে আসে, তব পিছু পিছু"। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর থেকে অনেকেই বলতে ভালোবাসেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব 'অনুপস্থিত' ছিলেন। কর্ণেল অলির কথা, "ওই রাতে শেখ মুজিব নিজ বাসায়ই ছিলেন এবং কারাগারে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলেন"। জিজ্ঞেস করতেই হয়, তিনি কি আপোষে-আরামে থাকার বাসনায় ইচ্ছে করেই 'অনুপস্থিত' ছিলেন? তিনি কি প্রাণ বাঁচাতেই কারাবরণের অপেক্ষা করছিলেন, নাকি অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য এবং সপ্রমাণ যৌক্তিক অভিপ্রায় ছিল তাঁর? একাত্তরের ২৫ মার্চ কালো রাতে শেষ পর্যন্ত যাঁরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই একজন হচ্ছেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম। সে রাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, ২৪ মার্চ বিকাল থেকে ২৫ মার্চ রাত ১০টা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সকলকে মুজিব ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। অনেকেই তাঁকে আত্মগোপনের অনুরোধ করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল, "আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।"

বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে ঢাকা শহরের অবস্থা সম্পূর্ণ জেনেও গ্রেপ্তার বরণের জন্য অপেক্ষার প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান ('বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড) লিখেছেন, সে-রাতের সাক্ষাৎকারীদেরকে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক, এটা চাই না"। বঙ্গবন্ধুর কথারই বিস্ময়কর সাদৃশ্য মেলে টিক্কা খানের বক্তব্যে, "ম্যায় আচ্ছি তেরা জানতা থে মুজিব য্যায়সা লিডার আপনি আওয়াম কো ছোড়কে নেহি যায়েঙ্গি। আমি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকার প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি বাড়িঘর...তল্লাশি চালাতাম।... অন্য কোন নেতাদের আমার গ্রেফতার করার ইচ্ছা ছিল না। এজন্য তারা সবাই খুব সহজেই ঢাকার বাইরে চলে যেতে পেরেছিল"। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার 'হিজ পিপ্‌ল' আর টিক্কা খানের 'য্যায়সা লিডার' এবং 'আপনি আওয়াম কো ছোড়কে নেহি যায়েঙ্গি' ইত্যাদি গভীর অর্থবহ কথাগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করলে বঙ্গবন্ধুর 'অনুপস্থিতি'র তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

"মুজিবের বন্দিত্ব মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার থেকেও অনেক বড় ঘটনা", অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের বিশ্লেষণ, "মুজিব যদি ধরা না দিয়ে পালিয়ে গিয়ে... কোনো

ভাঙ্গা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করতেন...তাহলে কি তিনি মুজিব হতেন?... মুজিব পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না, তিনি... হতেন সামান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী, এবং আমরা একটি বিশাল রাজনৈতিক ভাবপ্রতিমাকে হারাতাম, মুক্তিযুদ্ধে আমরা এত অনুপ্রাণিত বোধ করতাম না। যোদ্ধা মুজিবের চেয়ে বন্দী মুজিব ছিলেন অনেক শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ক, তিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন মহানায়ক...মুক্তিযুদ্ধের সময়টি ভরে তিনিই ছিলেন নিয়ন্ত্রক ও প্রেরণা... সমগ্র বাঙালির রূপ ধরে তিনিই করে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ।... প্রতিটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাই ছিল মুজিবের দ্বিতীয় সত্তা।" মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি সম্পর্কে যার ধারণা-অভিজ্ঞতা আছে, তাঁকেই মানতে হবে যে, হুমায়ূন আজাদের লেখায় ইতিহাসই কথা বলেছে, আবেগের ভাষায়। একটি মুজিবের কণ্ঠ থেকেই সেদিন লক্ষ-কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জয় বাংলা, বাংলার জয়।

চার

পাক-প্রেমীদের অভিযোগ, বঙ্গবন্ধু তাদের সাধের পাকিস্তান ভেঙ্গেছেন। বঙ্গবন্ধু কি পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য আদৌ দায়ী ছিলেন? সত্য বটে, নেতা হিসেবে মুজিব সততই ছিলেন উন্নত শির এবং জনতাকেও তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, উদ্বুদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তানী শোষণ আর অপ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। আজীবন সোচ্চার এবং প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিতে অভ্যস্ত মুজিব সত্তরের নির্বাচনে প্রতিফলিত গণরায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দাবি করেছিলেন; অন্যায় কিংবা অযৌক্তিক ছিল কি তাঁর সে অবস্থান? স্মরণ করা দরকার, সত্তরের নির্বাচনে ৩০০ আসনের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের ১৬৭টি পেয়েছিল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩১ আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপিপি পেয়েছিল মাত্র ৮৩টি। নির্বাচনের পরে, গণতান্ত্রিক নিয়মে সারা পাকিস্তানের শাসন-কর্তৃত্বই কি বাঙালির তথা মুজিবের প্রাপ্য ছিল না? অথচ ভুট্টো দাবি তুলেছিলেন, "We shall not sit in the opposition; we shall demand our due share in the government... We refuse to wait for five years to get an absolute majority" এবং এমন আচানক দাবির কারণ হিসেবে ভুট্টো বলেছিলেন, "the future Constitution could not be framed by one wing of the country and by the Awami League..." এই ছিল পাকিস্তানের সেনাচক্র সমর্থিত ভুট্টোর গণতন্ত্র। কারোই ভুলে যাবার কথা নয়, পরবর্তী সময়ের পাক সেনাশাসক-চক্রই স্বঘোষিত 'পাকিস্তানী হ্যামলেট' ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। অপরদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দায়ে তাদেরই কিছু দোসর হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে এবং অতঃপর তারা বাংলাদেশের ইতিহাসকেই হত্যা করছে নিরন্তর।

সাম্প্রতিক সময়ে যখন আবার একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি পুনরুচ্চারিত হচ্ছে, তখন কিছু মানুষ না-জেনে এবং কিছু মানুষ সবকিছু জেনেও

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলছেন, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদেরকে 'সাধারণ ক্ষমা' দিয়ে একটা মস্ত ভুল করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭৩ ইং তারিখে "নরহত্যা, নারীধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরণের সাহায্যে ঘরবাড়ি অথবা জলযান ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া" অন্য সকল দালালদের প্রতি সরকারের 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা হয়েছিল।

পিতার হৃদয় দিয়েই মুজিব অনুভব করতেন, বন্দী এবং বিচারাধীন দালালরা "নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুতপ্ত। তারা নিশ্চয়ই তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনায় রয়েছেন।... মুক্ত হয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।" আর একথাও মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও দালাল-রাজাকারদেরকে রাজনীতি করার 'লাইসেন্স' দেননি এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নিষিদ্ধই রেখেছিলেন। তাঁর সময় যুদ্ধাপরাধীরা বন্দী ছিল, বিচার চলছিল এবং তাদের নাগরিকত্ব বিলোপ করা হয়েছিল' কিন্তু মুজিব হত্যার পর সবকিছুই উল্টে দেয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সমালোচক-বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে আরেক দল মানুষ আছেন, যারা সরাসরি অবস্থান গ্রহণের ঝুঁকি এড়িয়ে প্রকারান্তরে মুজিবকেই অভিযুক্ত করে থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর উপমা টেনে তাঁরা বলেন, স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্র-শাসনে যুক্ত না হয়ে শেখ মুজিবের উচিত ছিল রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করা। তারা সম্ভবত ইচ্ছে করেই কিছু তথ্য-সত্য ভুলে থাকেন, প্রথমত, কেবল কংগ্রেস নয়, উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক দলই মহাত্মা গান্ধীকে ভারতের জাতির জনক মানতে অস্বীকার করার মতো অযৌক্তিক সাহস দেখায়নি। বরং অনেক রাজনৈতিক দলই শ্রদ্ধার সাথে নিজ নিজ দলীয় কার্যালয়ে গান্ধীর ছবি স্থাপন করেছে, তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুদিবস পালন করেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো, আওয়ামী লীগ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দলও এমন উদারতা দেখাতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, দলীয় রাজনীতির বাইরে গিয়েও মহাত্মা গান্ধী কিন্তু আততায়ীর হাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পাঁচ

ইতিহাসের বাঙালি মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন। মাত্র কয়েক বছর আগে, ঢাকা থেকে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' নামক দু'খণ্ডের বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে (৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং) অধ্যাপক মামুন বলছিলেন, বর্তমান সহজ যাত্রাপথের সামান্য ধকলেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আরো অর্ধশত বছর আগের একান্ত দুর্গম যোগাযোগের পথ পাড়ি দিয়ে একটা অজ পাড়াগাঁ থেকে উঠে এসে শেখ মুজিবুর রহমান কি করে

এমন পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্রচিন্তার অধিকারী হতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন একটা আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হতে? টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা এবং ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' নামক অগণতান্ত্রিক উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের শোষণ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্থপতি হয়ে ওঠা অনস্বীকার্যভাবেই বিশ্বরাজনীতির অন্যতম উজ্জ্বল বিস্ময়।

সুধীজন শামসুজ্জামান খানের পর্যবেক্ষণ, সমগ্র বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই বঙ্গবন্ধু একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক, যিনি মুসলিম সংখ্যাপ্রধান একটি দেশে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন থেকে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম প্রাগ্রসর চিন্তার রাজনীতিবিদ বলেই শ্রদ্ধা জানাতে হয়। 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আলোচনায় শামসুজ্জামান খান আরো বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তার অনুসরণে বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, ভৌগোলিক বাংলাদেশ থাকবে বটে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধটাই অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হবে। কারণ, পশ্চাদমুখী চেতনার দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতি বঙ্গবন্ধুর চরম বিরাগ আদৌ অস্পষ্ট ছিল না, আর দ্বিতীয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নামে-নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়নি।

আনুষ্ঠানিক আলোচনার এ পর্যায়ে আমার পাশের এক তরুণ শ্রোতার মন্তব্য আমাকে চমকে দিয়েছিল : দ্বিতীয় পাকিস্তান বা অপপাকিস্তানের কথা নয়, দ্বি-জাতিত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য এবং বাঙালির জন্য কল্যাণকর ভাবলে বঙ্গবন্ধু তো পাক-মার্কিন-চীন অক্ষের খেলার-পুতুল মুশতাক-মাহবুব-মওদুদ চক্রের কথিত আপোষের পথে 'Federating two Pakistan' ভিত্তিক সমাধান মেনে নিয়ে মূল পাকিস্তানেরই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার্যত বর্জন করেছিলেন দ্বি-জাতিতত্ত্বকে, আর তাই পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁকে এতটুকু আকর্ষণ করতে কিংবা আপোষের পথে টানতে পারেনি।

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আলজিয়ার্স গিয়েছিলেন ১৯৭৩ইং জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানকার দু'টি বিশেষ সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করছি এম. আর. আখতার মুকুলের 'বঙ্গবন্ধুর রক্ত লাল' বইটি থেকে। আশা করি এতেই প্রমাণিত হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ধার্মিক মুজিবের আস্থা ছিল কত গভীর এবং বাংলাদেশের আদর্শ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন কত অপরিহার্য। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি হঠাৎ করেই প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি 'আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব' করতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে শর্ত হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকে দেশের নাম বদলিয়ে 'বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র' করতে হবে। "জ্বলন্ত পাইপ থেকে একরাশ ধূঁয়া ছেড়ে... স্মিতহাস্যে বিনয়ের সঙ্গে" বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এ ধরনের প্রস্তাব আমার পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত। কারণ, সমগ্র

লিবিয়ায় যেখানে অমুসলিম জনসংখ্যা নেই বললেই চলে, সেখানে বাংলাদেশে অমুসলিমদের জনসংখ্যা প্রায় এক কোটির মতো। এক্সলেন্সি, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তো শুধু আল মুসলেমীন নন— তিনি তো রাব্বুল আলামীন"। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে। বাদশাহ গুরুতেই বললেন, "আমি শুনেছি যে, আসলে বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশী।... অবশ্য সাহায্য দেবার জন্য আমাদের কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে"। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, "এক্সেসেন্সি, বেয়াদবী নেবেন না।... আমার তো মনে হয় না, মিসকিনের মতো বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে।" আলোচনার এক পর্যায়ে বাদশাহ জানিয়েছিলেন, "সৌদী স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' করতে হবে"। মুজিব জবাব দিয়েছিলেন, "এই শর্তটা... বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান হলেও এদেশে প্রায় এক কোটির মতো অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়ে দুর্ভোগ পোহায়েছে। তাছাড়া, এক্সেলেন্সি, আল্লাহতায়ালা... আলামীন। তিনি শুধুমাত্র মুসলমানের আল্লাহ নন। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর অধিকর্তা।... এক্সেলেন্সি,... আপনাদের দেশটার নামও তো "ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদী এ্যরাবিয়া' নয়।... 'কিংডম অব সৌদী এ্যরাবিয়া'। কই আমরা কেউ তো এ নামে আপত্তি করিনি"। আকস্মিকভাবেই এ সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বৈঠক সমাপ্তির ঠিক আগে গভীর ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী উন্নতশির বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছিলেন, 'লাকুম দ্বিন নকুম ওয়ালিইয়াদ্বিন'– তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।

'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক তরুণের কথা আগেই বলেছি, ছিলেন আরো অনেকেই, যাদের অনেকেরই জন্ম সম্ভবত নৃশংস পঁচাত্তরের পরে। এঁরা ইতিহাসের নির্মাতা নন, দর্শকও নন, এঁরাই ইতিহাসের নির্মোহ পাঠক। কোনো রকম প্রত্যক্ষ আবেগ কিংবা অতীতমুখী স্মৃতির টানে নয়, তারা এসেছিলেন একান্তই নিজস্ব ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার কৌতুহলে, হয়তো অনাগত আগামীর পথের সন্ধানেও। শিক্ষা-শাসন-রাজনীতি-সংস্কৃতির সর্বস্তরে বিদ্যমান কিছু মানুষ যখন কোরাসে কলঙ্কিত করছেন বঙ্গবন্ধুকে, পঁচাত্তর পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে, তখনো এদেশের তরুণ প্রাণে সশ্রদ্ধ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েই আছেন বঙ্গবন্ধু মুজিব।

সেদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুণের কথাই সঠিক, বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুকে পৃথক করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধা এবং খ্যাতিমান সাংবাদিক হারুণ হাবিব যথার্থই বলছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংবিধানের যারা শত্রু, রাজনৈতিক ইসলাম বা মৌলবাদের যারা সমর্থক-সুবিধাভোগী, তারাই দ্বি-জাতিতত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার

ধারক-বাহক, তারা এখনো মৃত বঙ্গবন্ধুকেই বিবেচনা করে প্রধান প্রতিপক্ষ। প্রখ্যাত সাংবাদিক আবেদ খানের মন্তব্য, এতগুলি বছর আগে যে মানুষটিকে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীরা হত্যা করেছে, তারাই এখনো বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিময় অস্তিত্বের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু এখন এই দারুণ দুঃসময়ে সাহসী মানুষ বঙ্গবন্ধু আমাদের জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

ছয়

জ্ঞানীজনেরা বলেন, "Commitment and courage go together"— বস্তুত রাজনীতি ও ব্যক্তিজীবনে মুজিব ছিলেন এরই উজ্জ্বল উদাহরণ। অদম্য সাহস আর অনমনীয় লক্ষ্যে পথ চলেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্থপতি হয়েছিলেন। প্রাচীন যুগের রূপকথার হাতি কতজনকেই তো শুঁড় দিয়ে রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিত, এ আধুনিক যুগেও তো বিপ্লবের হাতি কাউকে কাউকে রাষ্ট্রনায়ক বানিয়ে দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রস্তুতিহীন কোনো আচানক প্রাপ্তি ঘটেনি। প্রথাগত বিপ্লবী ছিলেন না মুজিব, ষড়যন্ত্রের সাথেও ছিলেন সম্পর্কহীন, তিনি যা করেছেন, ঘোষণা দিয়েই করেছেন, করেছেন প্রকাশ্য রাজনীতির গণ-সম্পৃক্ততার পথেই। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে— এমন দাবি হয়তো কেউ করবেন না। কিন্তু রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডে তিনি কখনো কোনো প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গণ-স্বার্থের বিপরীতে আপোষ করেছেন কিংবা জনগণের ওপর আস্থা হারিয়েছেন— এমন নজির খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতেই হবে। কিন্তু এর বিপরীতে ব্যক্তি-জীবনে, বাংলার সংগ্রামী মানুষ, বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন সাহসী অবস্থানের নজির মিলবে তাঁর কর্মময় জীবনের সকল পর্যায়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া অসম্ভব জেনেই আজীবন-সংগ্রামী বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আশা করি বিন্দুতেই সিন্ধুর পরিচয় মিলবে।

কোলকাতার ছাত্রজীবনে শেখ মুজিব থাকতেন ইসলামিয়া হোস্টেলে। সেই হোস্টেল-সুপার, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান স্মৃতিকথামূলক লেখায় উল্লেখ করেছেন, ছাত্রজীবনের একটি ঘটনায় অভিযুক্ত মুজিব দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সামনে। কিন্তু কৃতকর্মের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সরল স্বীকারোক্তি প্রদানের ব্যাপারে মুজিবের সৎসাহস ও ঋজুতা তাঁকে অভিভূত করেছিল। শেখ মুজিবের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাদিতা বহুদর্শী অধ্যক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের তরুণ বয়সের চারিত্রিক অবস্থান ও আত্মবিশ্বাসের কথা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ইং পাকিস্তান আইন পরিষদে ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকেই মেনে নেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিব তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে রাষ্ট্রভাষার

প্রশ্নে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের ধর্মঘট-আন্দোলনের নেতৃত্বে যুক্ত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। শাস্তি হিসাবে এ ব্যাপারে জড়িত ছাত্রদেরকে জরিমানা করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনেকেই জরিমানার শাস্তি মেনে নিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু মুজিব তীব্র প্রতিবাদে এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আপোষহীন রাজনীতির উচ্চ আদর্শ বজায় রাখতেই মুজিবকে উচ্চ শিক্ষার আশা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থ থেকেই আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করছি। ১৯৫৫ইং পাক-শাসক চক্রের উদ্যোগে পূর্বে বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়, তখনই পাকিস্তান গণপরিষদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেই পাকিস্তানী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "বাংলা শব্দটার একটা ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য।" এই নাম পরিবর্তন করতে চাইলে "সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা"। এরই অবিচল ধারাবাহিকতায়, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনাধীন অবস্থাতেও সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর সভায় ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ইং মুজিব বলতে পেরেছিলেন, জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

১৯৬৯ সালে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারাধীন বন্দী হিসাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে স্থাপিত সামরিক আদালতে দাঁড়িয়েও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন, "বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।" মামলাটি চলাকালীন সময়েই, ফেব্রুয়ারি মাসে আইয়ুবের সামরিক সরকার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী শেখ মুজিবকে 'প্যারোলে মুক্ত' অবস্থায় লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাব করেছিল। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বড় বড় নেতাও প্যারোলে মুক্তির শর্তে লাহোর যেতে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শেখ মুজিব। উল্লেখ্য যে, তখন বিচারাধীন অন্যতম সহ-বন্দী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। অনেকেই বলতেন, মুজিবের মনোবল ভাঙ্গতেই সামরিক জান্তা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি সত্যিকার অর্থেই নির্ভীক বঙ্গবন্ধুর। অতঃপর অব্যাহত গণআন্দোলনের প্রবল চাপে বাধ্য হয়েই আইয়ুব-সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে মুজিবসহ সকল বিচারাধীন বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্ত মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লাহোরে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

উপরোক্ত ঘটনাবলী এবং বক্তব্য থেকেই লক্ষণীয় যে, বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জনগণকেই রাষ্ট্রের মালিক গণ্য করা, জনগণের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা

এবং প্রতিবাদের দৃঢ়তা ইত্যাদির বিরল সমন্বিত রূপটাই ছিল মুজিব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি পাকিস্তানী শাসকদের অভিপ্রায়-দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক উপলব্ধি করেই ক্রমশ নিজের রাজনৈতিক অবস্থানটি তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। এদেশের জনগণ, সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের চক্রান্ত বুঝতে যেমন তাঁর কোনো ভুল ছিল না, ঠিক তেমনি সাহস ছিল নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রকাশের।

অকুতোভয় মুজিবের একটা অনন্য বর্ণনা মেলে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের 'পূর্বাপর ১৯৭১ : পাকিস্তানের সেনা-গহ্বর থেকে দেখা' নামের বইটিতে। একাত্তরের মাঝামাঝি পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা সাজাতে হবে এবং তাঁকে অপরাধী প্রমাণ করে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে"। লায়ালপুর জেলে বসানো হয়েছিল 'কোর্ট মার্শাল' গোছের বিশেষ আদালত। শেখ মুজিবকে বলা হয়েছিল, তিনি ইচ্ছে করলেই তাঁর পছন্দমত উকিল নিয়োগের সুবিধা নিতে পারেন। "মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে মুজিব উত্তর দিলেন যে, তিনি পাকিস্তানীদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক আদালতকে কোনো আদালত বলেই মানেন না। ইয়াহিয়া খানকে যেন বলা হয় যে,... মুজিবকে যদি হত্যা করতে চায়... তা সে স্বচ্ছন্দে করতে পারে। বিচারের নামে কোনো প্রসহন করতে হবে না। মুজিব এই প্রহসনের আদালতকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেয় না।" তবু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে পাক-সরকার বিখ্যাত আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীকে মুজিবের ডিফেন্স কাউন্সিলর নিযুক্ত করেছিল। "তবে মুজিব ব্রোহীর সাথে কথা বলা দূরের কথা, তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েও দেখেননি।"

সাত

বঙ্গবন্ধুই বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে বীরের মতো বাঁচতে জানে।" বীর বাঙালির বীর নেতা মুজিব নিজেও তাঁর জনগণের কাছে, বিশ্বের কাছে চির-নির্ভয় বীর-চিত্ততার নজির সৃষ্টি করেছেন বহুবার। এমনকি মৃত্যুভয়ও তাঁকে ভীত কিংবা লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি।

পাকিস্তানীরা যে মুজিবকে হত্যা করতে পারেনি, তাঁকেই হত্যা করেছিল ষড়যন্ত্রে জড়িত কিছু বাঙালি সেনানায়ক। ঘাতকের উদ্যত বন্দুকের সামনে, অনিবার্য মৃত্যুর মুখেও সাহসী মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছিলেন মুজিব। অবশ্যই বলা দরকার, পিঠে নয়, ঘাতকের গুলি লেগেছিল মুজিবের বুকেই।

জীবনে এবং জীবনান্তের অনেক ঘটনাতেই ইতিহাসের সিরাজের সাথে মুজিবের মিল দৃষ্টি এড়াতে পারে না কোনো সচেতন বাঙালির। স্বভাবতই দৃষ্টি এড়ায়নি বহুদর্শী সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর, সিরাজ-মুজিব প্রতি তুলনার আখ্যান ভিত্তি করেই তিনি নির্মাণ করেছেন এক অনুপম ঐতিহাসিক

চলচ্চিত্র-ভাষ্য— 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'। ১৭৫৭ইং মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে সিরাজের পরাজয়ে বাংলার যে স্বাধীনতার অবসান ঘটেছিল, ১৯৭১-এ সকল ষড়যন্ত্র প্রতিকূলতাকে জয় করে সে স্বাধীনতাকেই আবার ফিরিয়ে এনেছেন বঙ্গবন্ধু মুজিব সেকালে মীরজাফর নামের আত্মীয় এবং প্রধান সেনাপতির ক্ষমতালীপ্সা এবং চক্রান্তে নিহত হয়েছিলেন সিরাজ আর একালে মুজিব হত্যার জন্য দায়ী মুজিবেরই বন্ধু-সহকর্মী মুশতাক। সিরাজের মায়ের-কাছে-পালিত মুহম্মদী বেগ হত্যা করেছিল সিরাজকে, আর মুজিবের নিজের স্নেহ-প্রশ্রয়-আস্থায় লালিত মোশতাক-ডালিম চক্র হত্যা করেছে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে। সময় এবং নাম-পরিচয়ের ব্যবধান ছাড়া অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া এবং ব্যাখ্যায় দুটো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে খুব ভিন্ন বলে মনে হয় কি?

নিজেদের অপকর্ম-শঠতা-লালসা এবং সর্বোপরি সিরাজ-হত্যার অমানবিক অপরাধ ঢাকতেই ইংরেজ এবং মীরজাফরদের বশংবদেরা সিরাজের চরিত্র হননে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মীরজাফর গংদের বক্তব্য কেউ মানেনি, কারণ সকলেই জানতো সিরাজের পরাজয় এবং হত্যার সুফলভোগী (Beneficiary) তারাই। ইংরেজ-মীরজাফরেরা কালের প্রবাহে চিহ্নিত হয়েছে প্রতারক-লোভী-বিশ্বাসঘাতক হিসেবে, আর বাংলার ইতিহাসে আবার উঠে এসেছেন স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে আপনজনের ষড়যন্ত্রে আপনজনেরই হাতে নিহত হতভাগ্য সিরাজ। বাংলাদেশে এখনো মুশতাক চক্রের ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে গেছে বলবার মত সময় আসেনি। ইতিহাসেরই শিক্ষা-ইতিহাসের অনিবার্য পুনরাবৃত্তি। সুতরাং ইতিহাসমনস্ক হলে দৃঢ় আস্থার সাথেই বলা যেতে পারে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও একই ধারায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সংস্কৃতিজন অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার কথা :

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ্ মুজিবুর রহমান।"